১২

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

Environment, Distribution and Conservation of Organisms

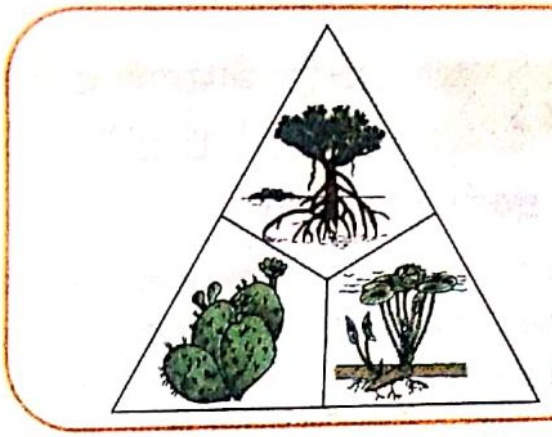

প্রধান প্রধান শব্দ

- প্রজাতি
- জীবগোষ্ঠী
- জীবসম্প্রদায়
- ইকোলজিক্যাল পিরামিড
- অভিযোজন
- বায়োম
- প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল
- এন্ডেমিক
- এক্সোটিক
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
- সবুজ বেষ্টনী
- জীববৈচিত্র্য
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ইনসিটু সংরক্ষণ
- এক্সসিটু সংরক্ষণ

পরিবেশের সাথে প্রতিটি জীবের এক অনন্য সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া রয়েছে। জীবনধারণের জন্য জীব তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশই জীবের অভিযোজন, ক্রমবিবর্তন ও অবলুপ্তির প্রধান কারণ। ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানের পরিবেশ এক রকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের কারণে এক এক অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক এক ধরনের জীব সম্প্রদায়। এসব জীবের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকলেও তাদের গঠন, জীবনাচরণ প্রভৃতিতে রয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য। পরিবেশের প্রভাবে যেমন জীবের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে জীবের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবেশের নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই জীব ও পরিবেশের মধ্যেকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা, গবেষণা ও অধ্যয়নকে **বাস্তুবিদ্যা** বা **Ecology** বলে। প্রকৃতির প্রধান দুটি উপাদান জীব ও পরিবেশ অত্যন্ত জটিল এবং গতিময় বা পরিবর্তনশীল। জীবের সাথে পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল। কোনো স্থানের পরিবেশের ওপর নির্ভর করে ঐ স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের প্রকৃতি ও বিস্তার।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায়
- ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ
- বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে তুলনা
- জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা
- বিভিন্ন ধরনের বায়োম
- প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ
- ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তার
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য
- বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম
- উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য
- উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা
- বিলুপ্তপ্রায় জীব
- জীব বিলুপ্তির কারণসমূহ
- বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
- বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণে সচেতনতা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায়
পাঠ ২	বাস্তুতন্ত্র ও ইকোলজিক্যাল পিরামিড
পাঠ ৩	জীবের অভিযোজন: জলজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৪	জীবের অভিযোজন: মরুজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৫	জীবের অভিযোজন: লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৬	বায়োম: স্থলজ বায়োম
পাঠ ৭	বায়োম: জলজ বায়োম
পাঠ ৮	প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল
পাঠ ৯	ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
পাঠ ১০	বাংলাদেশের বনাঞ্চল: পর্ণমোচী বনাঞ্চল
পাঠ ১১	বাংলাদেশের বনাঞ্চল: চিরহরিৎ, মিশ্র চিরহরিৎ বনাঞ্চল
পাঠ ১২	ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
পাঠ ১৩	উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী
পাঠ ১৪	জীববৈচিত্র্য
পাঠ ১৫	বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীব
পাঠ ১৬	জীববৈচিত্র্য সংকট ও বিলুপ্তপ্রায় [illegible]
পাঠ ১৭	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ ১৮	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

CamScanner

পাঠ ১

প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায়
Species, Population and Biotic Community

১২.১ প্রজাতি (Species)

প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত ১৮ লক্ষের মতো উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব শনাক্ত হয়েছে। তবে এখনও প্রজাতির ধারণা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে **প্রজাতি হলো বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মিল সম্পন্ন একদল জীব যাদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনে উর্বর বংশধর উৎপন্ন হয় এবং একদল অন্যদল থেকে জন্মগতভাবে পৃথক**। বিখ্যাত শ্রেণীকরণবিদ **Ernst Myer**-এর মতে প্রজাতি হচ্ছে, "Reproductively isolated organismal group" (অর্থাৎ, প্রজনন বৈষম্যতা সম্পন্ন একদল জীবগোষ্ঠী) যেমন– গাধা ও ঘোড়া দু'টি ভিন্ন প্রজাতি, কারণ এদের সংকর (খচ্চর) বন্ধ্যা হয়। তাছাড়া বন্ধ্যা হওয়ায় খচ্চর নিজেও কোনো প্রজাতি নয় (এজন্য এর কোনো বৈজ্ঞানিক নাম নেই)। তবে ট্যাক্সোনমিস্টগণ প্রজাতিকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁরা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোসোমের বৈশিষ্ট্য, এমনকি DNA অনুক্রমের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে পোর্টার (Porter, 1959)-এর মতে **একটি প্রজাতি হলো স্পষ্টত স্ব-বংশবিস্তারে সক্ষম জীব সমষ্টি, যারা কম বেশি বংশগতিমূলক, ভৌগোলিক, এমনকি পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা পৃথকীকৃত**। একই প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহে একই ধরনের 'জিন পুল' লক্ষ্য করা যায়। এজন্য একই প্রজাতির সকল জীবের গঠন, কার্যাবলি, জনন, বিকাশ ও নীশ (niche) একই ধরনের হয়ে থাকে।

ICBN স্বীকৃত সর্বনিম্ন স্তর হলো প্রজাতি এবং শ্রেণিবিন্যাসের জন্য এটাকেই **মৌলিক স্তর** বা ট্যাক্সোন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রজাতির নাম প্রকাশের সময় দ্বিপদ নামকরণ প্রথা ব্যবহার হয়। যেমন- ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa* L.

প্রজাতির বৈশিষ্ট্য:

১. এক দল জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, ছত্রাক) যারা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিল সম্পন্ন।

২. একই প্রজাতিভুক্ত জীব একটির সাথে অপরটি ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য প্রজাতিভুক্ত কোনো জীবের সাথে ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

৩. একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলে তা হবে নিরবচ্ছিন্ন (continuous)।

৪. একটি প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন একক যা দুটি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন- *Corchorus capsularis, C. olitorius* (গণ নাম একবার পূর্ণ লেখার পর পরবর্তীতে প্রথম অক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম আছে), *Artocarpus heterophyllus* (কাঁঠাল), *Mangifera indica* (আম) ইত্যাদি।

পৃথবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

পৃথিবীতে বর্তমান বর্ণনাকৃত (described) ও অনুমিত (estimated) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ (sources : Jeffries. M. J. 1997; Prance G.T. 1992)

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	৪,০০০	১০,০০,০০০
ছত্রাক	৭২,০০০	১৫,০০,০০০
শৈবাল	৪০,০০০	২,০০,০০০

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
লাইকেন	১৩,৫০০	২০,০০০
মস	৮,০০০	৯,০০০
লিভারওয়ার্টস	৬,০০০	৭,০০০
ফার্ন ও ফার্নতুল্য	১২,০০০	১২,৫০০
জিমনোস্পার্ম	৬৫০	৬৫০
অ্যানজিওস্পার্ম	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০

বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

'বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ' অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বর্ণনাকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির (প্রকরণসহ) সংখ্যা নিম্নরূপ:

উদ্ভিদ প্রজাতি	সংখ্যা	উদ্ভিদ প্রজাতি	সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	১৭১	ব্রায়োফাইটা	২৪৮
সায়ানোব্যাকটেরিয়া	৩০০	টেরিডোফাইটা	১৯৫
ছত্রাক	২৭৫	নগ্নবীজী উদ্ভিদ	০৫
শৈবাল	২,২৪৫	আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৩,৬১১

এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর গত পাঁচ-ছয় বছরে শৈবাল ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আরো কিছু প্রজাতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সংখ্যা উদ্বৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে।

১২.২ জীবগোষ্ঠী (Population)

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থেকে একত্রে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে। **কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির জীবসমূহকে একত্রে জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলে।** পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কোনো স্থানের উদ্ভিদ বা প্রাণীর পপুলেশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য বিভিন্ন সময়ে একই স্থানের পপুলেশন বিভিন্ন ধরনের হতে দেখা যায়। সার্বিক বৃদ্ধির উপযোগী পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোনো এলাকায় পপুলেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জেনে রাখো

'পপুলেশন' শব্দটি ল্যাটিন 'পপুলাস' (populus) থেকে উদ্ভূত। এর মানে হলো 'জনগণ' (people)। সাধারণভাবে পপুলেশন বলতে মানব জনসংখ্যাকেই বোঝানো হয়। বাস্তুবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে পপুলেশন হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিভুক্ত জীবদের সমষ্টি বা একটি দল, যারা নিজেদের মধ্যে বংশবিস্তারে সক্ষম।

কোনো স্থানের উদ্ভিদ পপুলেশন অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে একই প্রজাতির উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আলো, বাতাস, পুষ্টি, আবাস্থলের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে প্রাকৃতিকভাবে প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে। পপুলেশন বাস্তুবিজ্ঞান নামক শাখায় প্রধানত (ক) পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য, (খ) পপুলেশনের গতিশীলতা ও (গ) পপুলেশনের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Population)

যেসব বিশেষত্বের জন্য একটি পপুলেশন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে তাদেরকে পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়। উদ্ভিদ পপুলেশনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. **পপুলেশন আকার ও ঘনত্ব (Size and Density):** কোনো পপুলেশনের উদ্ভিদ সংখ্যাকে পপুলেশন আকার বলা হয়। পরিবেশের একক আয়তনের স্থানে কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ সংখ্যাই পপুলেশন ঘনত্ব। যেমন - প্রতি হেক্টর বনে ৫০০টি শাল গাছ বা প্রতি কিউবিক মিটার পানিতে এক মিলিয়ন শৈবাল।

CamScanner

২. **বিস্তার (Dispersion):** কোনো আবাসস্থলে পরস্পরের স্বাপেক্ষে পপুলেশনের সদস্যদের অবস্থানকে বিস্তার বোঝায়। আবাসস্থলে সাধারণত একই প্রজাতির উদ্ভিদ সমদূরত্বে বা বিক্ষিপ্তভাবে কখনও বা স্থানে স্থানে গুচ্ছ অবস্থায় বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়।

৩. **জন্ম-মৃত্যুহার (Natality and Mortality):** জন্ম-মৃত্যুহারের উপর পপুলেশনের পরিবর্তন ঘটে। জন্মহার বলতে কোনো পপুলেশনে বার্ষিক নতুন উদ্ভিদ উৎপাদনের শতকরা হার এবং মৃত্যুহার দ্বারা কোনো পপুলেশনের বার্ষিক মোট মৃত উদ্ভিদের শতকরা হার বোঝানো হয়। জন্ম থেকে মৃত্যুহার কম হলে পপুলেশনের বৃদ্ধি ঘটে। আর জন্ম ও মৃত্যুহার সমান হলে সে পপুলেশনের বৃদ্ধি শূণ্য হয়।

৪. **বয়সিক গঠন (Age Structure):** একটি উদ্ভিদ পপুলেশনে বিভিন্ন বয়সের উদ্ভিদ থাকে। কোনো উদ্ভিদ পপুলেশনে বিভিন্ন বয়সের উদ্ভিদ সংখ্যার আনুপাতিক হারকে বয়সিক গঠন বলে। পুরাতন বনভূমিতে অধিক বয়সের উদ্ভিদ সংখ্যা বেশি থাকে এবং নবসৃষ্ট পপুলেশনে অল্পবয়সী উদ্ভিদের সংখ্যা বেশি হবে।

৫. **বর্ধন ক্ষমতা (Biotic Potential):** প্রত্যেক প্রজাতির উদ্ভিদের বর্ধন ক্ষমতা তার অন্তর্নিহীত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থায় একটি আম গাছ যেমন অসীম বৃদ্ধি লাভ করে না তেমনি কোনো আবাসস্থলে এর অসীম সংখ্যাবৃদ্ধিও হয় না। অনুকূল পরিবেশে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাওয়াই উদ্ভিদের বর্ধন ক্ষমতা। যেকোনো পরিবেশে উচ্চ শ্রেণীর জীব অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জীব বা অণুজীবের বর্ধন ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি।

৬. **জীবন সারণি (Life Table):** বিভিন্ন বয়সে বা বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো পপুলেশনে জীবের বেঁচে থাকা বা মৃত্যুর সম্ভাবনা জীবন সারণি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। জীবন সারণির সাহায্যে পপুলেশন বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায়।

৭. **পপুলেশনের গতিশীলতা (Population Dynamics):** কোনো স্থানের উদ্ভিদ পপুলেশন সবসময় পরিবর্তনশীল। জন্ম-মৃত্যু, অভিবাসন ও বহির্গমনের জন্য পপুলেশনে জীবসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। কোনো পপুলেশনে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশি হলে পপুলেশনের বৃদ্ধি ঘটে। অনুরূপভাবে নতুন উদ্ভিদের অভিবাসনের ফলেও পপুলেশন বৃদ্ধি পায়। আবার বহির্গমনের ফলে পপুলেশনের আকার হ্রাস পায়। এছাড়া জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার বেশি হলে পপুলেশন হ্রাস পায়।

৮. **পপুলেশন নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Population):** প্রত্যেক পপুলেশনের বৃদ্ধির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কতিপয় জীবের সাথে সম্পর্ক ও পরিবেশগত প্রভাবক দ্বারা কোনো স্থানের উদ্ভিদ পপুলেশন নিয়ন্ত্রিত হয়। পরজীবিতা, এন্টিবায়োসিস ও প্রতিযোগিতা পপুলেশন নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রভৃতি কারণেও পপুলেশন নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সকল প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে ভৌগোলিক সীমিত স্থানে বসবাস করে তাদেরকে **বিরল প্রজাতি (rare species)** বলে।

পপুলেশন বা উদ্ভিদ প্রজাতি বণ্টনে প্রধান প্রভাবকগুলো হলো–

১. **জলবায়ুগত প্রভাবক:** যেমন– সূর্যালোক, পানি ও বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি।

২. **মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক:** যেমন– মাটিতে পানির পরিমাণ, মাটির তাপমাত্রা, মাটির বিক্রিয়া, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির বাতাস ইত্যাদি।

৩. **ভূ-সংস্থান সম্পর্কিত প্রভাবক:** যেমন– সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, পাহাড়ের ঢাল ইত্যাদি।

৪. **জীব সম্পর্কিত প্রভাবক:** যেমন– উদ্ভিদের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক, ধারক উদ্ভিদ ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ইত্যাদি।

CamScanner

১২.৩ জীবসম্প্রদায় (Biotic Community)

একমাত্র মানুষের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়া এমন কোনো প্রাকৃতিক আবাসস্থল পাওয়া যাবে না যেখানে শুধু উদ্ভিদ অথবা শুধু প্রাণী বসবাস করে। বরং উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীব দলগতভাবেই একটি অঞ্চলে বসবাস করে। সেখানে তারা পরস্পর বিভিন্ন প্রয়োজনে নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল সকল প্রজাতির সকল গোষ্ঠীকে মিলিতভাবে একটি জীবসম্প্রদায় বা বায়োটিক কমিউনিটি বলে। তাই একটি জীবসম্প্রদায়কে বহুপ্রজাতিক সম্প্রদায়ও বলা হয়ে থাকে।

যখন একটি নিয়ন্ত্রিত আবাসস্থলে শুধু উদ্ভিদ থাকে তখন সেটা **উদ্ভিদ সম্প্রদায়** (plant community) আর শুধু প্রাণী থাকলে সেটাকে **প্রাণি সম্প্রদায়** (animal community) বলে। প্রাকৃতিকভাবে একটি সম্প্রদায়ে যেহেতু অনেকগুলো প্রাণিগোষ্ঠী এবং অনেকগুলো উদ্ভিদগোষ্ঠী থাকে সেজন্য একটি গোষ্ঠীকে কোনো সম্প্রদায়ের একটি মাত্র অংশ বলা যেতে পারে। কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী পৃথকভাবে না থেকে একত্রে মিলে মিশে থাকে।

জীবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১. **প্রজাতির ভিন্নতা:** প্রত্যেক জীব সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্প্রদায়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়। প্রত্যেক জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন ইত্যাদির ব্যাপারে একে অন্যের উপর ও জড় পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়।

২. **বৃদ্ধির ধরন ও গঠন:** একটি জীব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের বৃদ্ধির ধরণ ও গঠন বিভিন্ন রকম হয়।

৩. **আধিপত্য:** জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

৪. **স্তরবিন্যাস:** প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুযায়ী লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে, যেমন একটি বন সম্প্রদায়ে (forest community) – **i. ওভারস্টোরি স্তর-** সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষগুলো এই স্তর গঠন করে থাকে এবং অন্যদের উপর ছায়া দিয়ে থাকে। এই স্তরের বসবাসকারী পাখিও ভিন্ন প্রজাতির হয়। **ii. আন্ডারস্টোরি-** ওভারস্টোরি থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত। এরাও তেমন ছায়াপ্রিয় নয়। **iii. ট্রান্সগ্রেসিভ স্তর-** ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত। **iv. চারাস্তর-** বড় বৃক্ষের চারা এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এই স্তর গঠিত। **v. ভূ-সংলগ্ন স্তর-** এই স্তরে প্রচুর হিউমাস থাকে এবং এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পোকামাকড় ইত্যাদি থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো **বিয়োজক** অর্থাৎ জৈব স্তর পঁচনে সাহায্য করে।

৫. **ক্রমাগমন:** কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব সম্প্রদায় বহুদিন বসবাসের কারণে ঐ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে কোনো কোনো জীবপ্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে আর কোনো কোনো জীবপ্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত এমন হতে থাকে। একটি পুকুর বহুদিনের ব্যবধানে একটি জঙ্গলে পরিণত হতে পারে।

৬. **খাদ্য স্তর গঠন ও পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** একটি সম্প্রদায়ভুক্ত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি খাদ্যশৃঙ্খল ও একটি শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পচনকারী সব ধরনের জীবেরই সমাবেশ ঘটে।

৭. **সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন:** সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন হয়। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এই পরিবর্তন লক্ষণীয়।

CamScanner

পাঠ ২

বাস্তুতন্ত্র ও ইকোলজিক্যাল পিরামিড
Ecosystem and Ecological Pyramid

১২.৪ বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

ইকোসিস্টেম এমন একটি জটিল ব্যবস্থা যেখানে বসতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী একত্রে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল একক হিসেবে কাজ করে এবং একের সম্পদ ও শক্তি অন্যের সম্পদ ও শক্তিতে মিশে একই নিয়মে অপরের দেহে প্রবাহিত হয়। এখানে বসতি বলতে পরিবেশের জড় ও ভৌত অবস্থা, আর জীব বলতে উৎপাদক, খাদক আর বিয়োজককে বুঝানো হয়। তৃণভূমি, বনভূমি, পুকুর, নদী, সাগর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ।

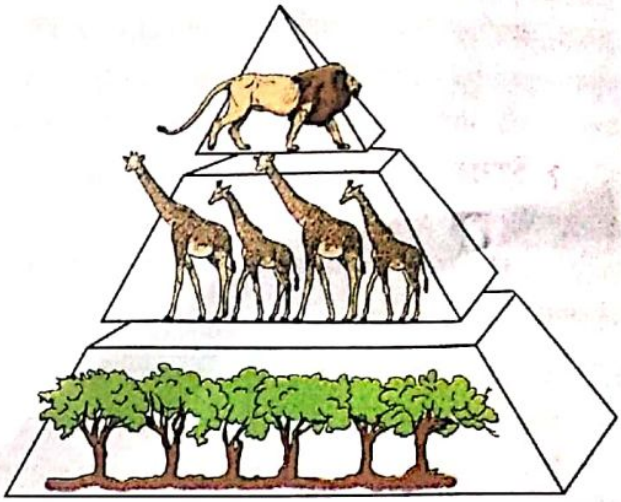

চিত্র-১২.১: একটি আদর্শ ইকোলজিক্যাল পিরামিড

কোনো স্থানের (একটি পুকুর, তৃণভূমি, চারণভূমি, জঙ্গল) **জীব সম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম**। জড় (মাটি, পানি, আলো, জৈব ও অজৈব বস্তু) এবং জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অণুজীব) উপাদান দিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়। **একটি বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান হলো :**

১. **উৎপাদক (Producer):** উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদ। পুকুর বা বিলের প্রধান উৎপাদক হলো **ফাইটোপ্লাংক্টন**। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে। প্রকৃতপক্ষে সবুজ উদ্ভিদ তাদের উৎপাদিত খাদ্যের ভেতরে সূর্যশক্তি ধরে রাখে যা পরে খাদকে প্রবাহিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে) সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি বন্ধন হয় তাকে বলা হয় **মোট উৎপাদন** (gross production) এবং শ্বসনকার্যে শক্তি খরচ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **প্রকৃত উৎপাদন** (net production)। প্রতি ইউনিট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় সেই হারকে বলা হয় Productivity।

২. **খাদক (Consumer):** উৎপাদক খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারাই **খাদক**। খাদক হলো প্রাণিকুল। পুকুরে **জুপ্লাংক্টন** সরাসরি ফাইটোপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই জুপ্লাংক্টন হলো **প্রাথমিক খাদক** (primary consumer)। তিতপুঁটি, মলা, খলিশা ইত্যাদি জুপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই এরা হলো **সেকেন্ডারি খাদক**। গজার, শোল, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মলা, খলিশা খেয়ে থাকে তাই এরা হলো **টারশিয়ারি খাদক**। মাছরাঙা, বক এরাও টারশিয়ারি খাদক হতে পারে।

৩. **বিয়োজক (Decomposer):** বাস্তুতন্ত্রের কতক ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মৃত জীবদেহ বা দেহাংশ পচিয়ে জৈব ও অজৈব পদার্থরূপে রূপান্তর করে থাকে। তাই ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো **বিয়োজক**। এরা মৃত জীবের জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে বলে এদেরকে বলা হয় স্যাপ্রোফায (saprophage)। এদেরকে **ট্রান্সফরমারও** বলা হয়। অবশ্য এরা খাদ্যশৃঙ্খলের অংশ নয়, তবে বিয়োজক না থাকলে খাদ্যশৃঙ্খল বন্ধ হয়ে যায়।

উৎপাদক থেকে বিভিন্ন জীবস্তরের মধ্য দিয়ে খাদ্যশক্তির প্রবাহকে **খাদ্যশৃঙ্খল বা ফুড চেইন** বলে। ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে **ট্রফিক লেভেল** (trophic level) বলে। প্রকৃতিতে যেকোনো বাস্তুতন্ত্রে একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকে যাকে **ফুড ওয়েব** (food web) বা **খাদ্যজাল** বলে। মানুষ *Spirulina* (উৎপাদক), মলা মাছ (সেকেন্ডারি খাদক), শোল, গজার, বোয়াল মাছ (টারশিয়ারি খাদক) সবই খায়। তাই মানুষ সর্বভুক।

কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল

উৎপাদক	→ প্রাথমিক খাদক	→ সেকেন্ডারি খাদক	→ টারশিয়ারি খাদক	পরিবেশ
১. ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাঙ্কটন	→ ছোট মাছ (মলা, তিতপুঁটি)	→ শোল, গজার, বোয়াল বা মাছরাঙা, বক	১. পুকুর বা বিলের খাদ্যশৃঙ্খল
২. ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাঙ্কটন	→ ছোট মাছ (হেরিং ফিস)	→ হাঙ্গর	২. সমুদ্রের খাদ্যশৃঙ্খল
৩. সবুজ উদ্ভিদ	→ ঘাসফড়িং	→ ব্যাঙ	→ বাজপাখি	৩. স্থলজ পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খল

১২.৫ ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramids)

প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের মধ্যে জীবের সংখ্যা, বায়োমাসের পরিমাণ এবং শক্তির পরিমাণের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন স্তরের খাদক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এজন্যে বাস্তুতন্ত্রের জীবজ উপাদানসমূহের পুষ্টিস্তর ভিত্তিক আন্তঃসম্পর্কের নকশাটি উর্দ্ধমুখীভাবে পর্যায়ক্রমিক সংকুচিত হয় এবং একটি পিরামিডের মতো দেখায়, যা ইকোলজিক্যাল পিরামিড (ecological pyramid) নামে পরিচিত। তবে ইকোলজিক্যাল পিরামিড উল্টানো প্রকৃতিরও হতে পারে।সেজন্য **ইকোলজিক্যাল উপাত্তের ভিত্তিতে পিরামিড আকৃতির যে নকশা পাওয়া যায় তাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।** Charles Elton (১৯২৭) সর্বপ্রথম ইকোলজিক্যাল পিরামিডের ধারণা প্রদান করেন।

ইকোলজিক্যাল পিরামিড তিন প্রকার :

১. সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Number),
২. বায়োমাস-এর পিরামিড (Pyramid of Biomass) ও
৩. শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)

১২.৫.১ সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Number)

কোনো বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও বিভিন্ন শ্রেণির খাদকের সংখ্যা সমান থাকে না। বরং যেকোনো এক দিকে বাড়তে বা কমতে থাকে। **যে নকশার সাহায্যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের জীবসমূহের সংখ্যাভিত্তিক আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে সংখ্যার পিরামিড বলে।** তৃণভূমি বা জলজ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে এবং এর উপর নির্ভরশীল প্রাথমিক, গৌণ, তৃতীয় স্তরের খাদক সংখ্যা পর্যায়ক্রমিকভাবে কমতে থাকে। এ জন্যে এমন বাস্তুতন্ত্রের সংখ্যার পিরামিড উর্দ্ধমুখীভাবে সংকুচিত হয় (চিত্র-১২.২ক)।

চিত্র-১২.২ ক: সংখ্যার পিরামিড (তৃণভূমি)

কিন্তু সবসময় সংখ্যার পিরামিড উর্ধ্বমুখী হয় না। উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষের বাস্তুতন্ত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃহৎ একটি বৃক্ষে শত শত কীট-পতঙ্গ বাস করে। এসব কীট-পতঙ্গনির্ভর পরজীবী অণুজীবের সংখ্যা কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা কয়েকশতগুণ বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদক, প্রাথমিক খাদক ও গৌণ খাদক সংখ্যার ভিত্তিতে সাজানো হলে একটি উল্টানো পিরামিডের মতো দেখাবে (চিত্র-১২.২খ)।

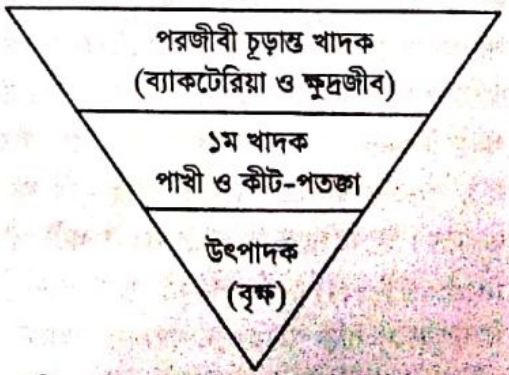

চিত্র-১২.২ খ : সংখ্যার পিরামিড (উল্টানো)

CamScanner

১২.৫.২ বায়োমাসের পিরামিড (Pyramid of Biomass)

জীবজ পদার্থের মোট শুষ্ক ওজনকে বায়োমাস বলে। অনেক সময় ঘন আয়তন বা তাজা ওজন হিসেবেও বায়োমাস প্রকাশ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের সদস্য জীবসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের নকশাটি বায়োমাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠলে তাকে বায়োমাসের পিরামিড বলে। একই বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন উপাদানের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন দেখা যায় বলে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বায়োমাসের পিরামিড ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অধিকাংশ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের বায়োমাস খাদক অপেক্ষা বেশি থাকে বলে বায়োমাস পিরামিড উর্দ্ধমুখী হয় (চিত্র-১২.৩)।

চিত্র-১২.২ গ: বায়োমাস পিরামিড

১২.৫.৩ শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)

খাদ্যশৃঙ্খলে এক পুষ্টি স্তর হতে অন্যস্তরে শক্তি স্থানান্তরের পূর্বে বেশির ভাগ শক্তি তাপ, চলন, বিপাক ক্রিয়া, অপাচ্য খাদ্য, মল-মূত্র আকারে ব্যয় হয় এবং সামান্য পরিমাণ শক্তি (১০%) পরবর্তী পুষ্টি স্তরের খাদকে স্থানান্তরিত হয়। এটি "১০ এর নীতি $\left(\frac{১}{১০}\right)''$ নামে পরিচিত। কোনো বাস্তুতন্ত্রের এক বর্গমিটার স্থানের জীবসমূহের মধ্যে একবছর সময়কালে যে পরিমাণ শক্তির স্থানান্তর ঘটে তার ভিত্তিতে শক্তির পিরামিড প্রকাশ করা হয় এবং পুষ্টিস্তরের বায়োমাসের ভিত্তিতে শক্তির পরিমাপ করা হয় (চিত্র-১২.৪)। **বাস্তুতন্ত্রে প্রত্যেক পুষ্টিস্তরের জীবসমষ্টির আহরিত শক্তি ও স্থানান্তরিত শক্তির নকশাকে শক্তির পিরামিড বলে।** শক্তির পিরামিড সব সময় উর্দ্ধমুখী হয়। জীব সম্প্রদায়ে **শক্তি প্রবাহের মূল উৎস হলো সৌরশক্তি** এবং শক্তির প্রবাহ একমুখী।

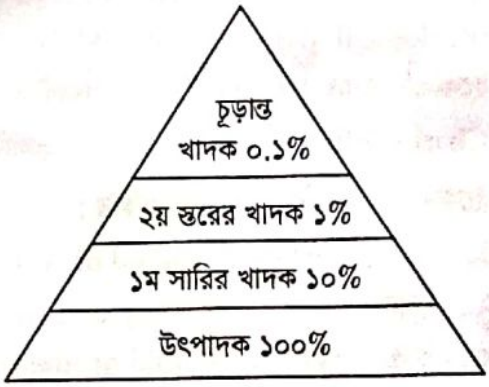

চিত্র-১২.২ ঘ: শক্তির পিরামিড

১২.৬ শক্তি প্রবাহ (Energy Flow)

ইকোসিস্টেমের মধ্যদিয়ে সৌর শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ (energy flow, মোট আলোক শক্তির মাত্র ০.০১ ভাগ) বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধৃত হয় এবং গ্লুকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে খরচ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই শক্তি শূন্যে (space) চলে যায়, জীবজগৎ এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই শক্তি প্রবাহ একমুখী (linear)। শক্তি প্রবাহিত হয় ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ ঘটে খাদ্যশৃঙ্খলে (food chain)। যে গতিপথে খাদ্য এক স্তর (trophic or feeding level) থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হয় সেই গতিপথকে খাদ্যশৃঙ্খল বা ফুড চেইন (food chain) বলে। খাদ্যশৃঙ্খলে শক্তি পর্যায়ক্রমে খাদ্যের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়। প্রডিউসার বা উৎপাদক সৌর শক্তিকে গ্রহণ করে খাদ্যশৃঙ্খল তথা ফুড চেইন-এর সূচনা করে। প্রকৃতিতে যেকোনো ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। পরস্পর একাধিক খাদ্যশৃঙ্খলের জটিল সংযোগ অবস্থাকে ফুড ওয়েব (food web) বলে।

CamScanner

শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য: ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. শক্তি প্রবাহ একমুখী।
২. শক্তির মূল উৎস সৌরশক্তি।
৩. সৌরশক্তি প্রথমে উৎপাদকের দেহে আহরিত হয় এবং পরে তা বিভিন্ন খাদকে স্থানান্তরিত হয়।
(i) সূর্য → (ii) উৎপাদক → (iii) খাদক (প্রাথমিক → সেকেন্ডারি → টারশিয়ারি)।
৪. খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে।

শক্তি ইকোসিস্টেমে (খাদ্য হিসেবে) নিম্নরূপে প্রবাহিত হয়–

১. উৎপাদক (Producer) → **২. তৃণভোজী খাদক** (Herbivores) → **৩. মাংসাশী খাদক** (Carnivores)

শক্তি প্রবাহের দশমাংশ নিয়ম : খাদকরা যত উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার দশমাংশ মাত্র ব্যবহারকারীর (খাদকের) দেহ গঠনের কাজে লাগে। যেমন– ১টি হরিণ যদি ১০০ কেজি তৃণ আহার করে তাহলে মাত্র ১০ কেজি তার দেহ গঠনে কাজে লাগে। ১টি বাঘ যদি হরিণের ১০ কেজি মাংস খায় তাহলে ঐ মাংসের মাত্র ১ কেজি বাঘের দেহ গঠনে কাজে লাগে। শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যায় এটি ১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত। **Lindeenmann (1942) এ মতবাদের প্রবর্তক।**

১২.৭ বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন (Biological Magnification)

পরিবেশ থেকে জীবদেহে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও জমা হতে পারে। দেহে জমাকৃত বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব নিম্নস্তর জীবদের (যেমন– উৎপাদক) তুলনায় পরবর্তী স্তরের জীবদেহে অধিক থাকে। খাদ্যশৃঙ্খল নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর অবস্থানরত জীবদেহে বিষের ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন** (Biological Magnification)। আমেরিকাতে (১৯৫০ দশকে) ফসলে DDT প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় ঈগল (খাদ্যশৃঙ্খলে সর্বোচ্চ স্তরে) প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। পরবর্তীতে সরকার DDT নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

শ্রেণির কাজ

বিভিন্ন ধরনের ইকোলজিক্যাল পিরামিডের মধ্যে পার্থক্য লিপিবদ্ধ করো এবং শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও।

পাঠ ৩

জীবের অভিযোজন: জলজ পরিবেশে অভিযোজন
Adaptation of Organisms: Aquatic Adaptation

১২.৮ জীবের অভিযোজনের ধারণা (Concept of Adaptation of Organisms)

সকল উদ্ভিদ যেমন একই পরিবেশে জন্মায় না, তেমনি সকল প্রাণীও একই পরিবেশে বসবাস করে না। বরং এক এক ধরনের নিবাসে এক এক প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, কোনো নির্দিষ্ট নিবাসে যে উদ্ভিদ বা প্রাণীগুলো জন্মে বা বাস করে তাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে সে ঐ পরিবেশে নিজেকে সফলভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নির্দিষ্ট নিবাসের জন্য উপযুক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য সেখানকার উদ্ভিদে থাকে বলেই সে ঐ নিবাসের জন্য উপযুক্ত। তেমনি একই উদ্ভিদ বিভিন্ন পরিবেশের জন্য অনুপযুক্ত। কোনো নিবাসে বসবাসের জন্য একটি জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাকে অভিযোজন বলে। প্রতিটি প্রজাতির জীবে নির্দিষ্ট অভিযোজনের বিকাশ ঘটলে ঐ নিবাসের সকল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমন অভিযোজন ঘটে থাকে। যেমন– সকল ভাসমান জলজ উদ্ভিদে অ্যারেনকাইমা (বায়ু কুঠরিযুক্ত প্যারেনকাইমা) টিস্যু থাকে। আবার সকল মরুজ উদ্ভিদে স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু (যান্ত্রিক টিস্যু) বেশি থাকে।

CamScanner

পরিবেশ ভিত্তিক উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিন্যাস

ওয়ার্মিং (Warming, ১৯০৯) মাটির প্রকৃতি এবং মাধ্যমে পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদগুলোকে প্রথমত তিনটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত করেন। যেমন- হাইড্রোফাইট, মেসোফাইট এবং জেরোফাইট। লোনামাটির অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য বিশেষ ধরনের লবণ সহনশীল উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এদের হ্যালোফাইট বা লোনা মাটির উদ্ভিদ বলে।

১২.৯ জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)

যেসব উদ্ভিদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পানিতে জন্মে ও বাস করে তাদের জলজ উদ্ভিদ বলে। যেমন- কচুরিপানা।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

১. কাণ্ড নরম, দুর্বল, সরু, লম্বা মধ্যপর্বযুক্ত, মূলাবদ্ধ উদ্ভিদের কাণ্ড রাইজোম প্রকৃতির।
২. মূল ও মূলরোম থাকে না, থাকলেও সুগঠিত নয়।
৩. দেহে মোমের আবরণ থাকে, পত্ররন্ধ্র থাকে না, থাকলে অকার্যকর, রক্ষীকোষ নাও থাকতে পারে।
৪. দেহে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।
৫. যান্ত্রিক টিস্যু কম বা অনুপস্থিত।
৬. ভাস্কুলার বান্ডল অনুন্নত।
৭. প্রধানত অজাজ জনন ঘটে।

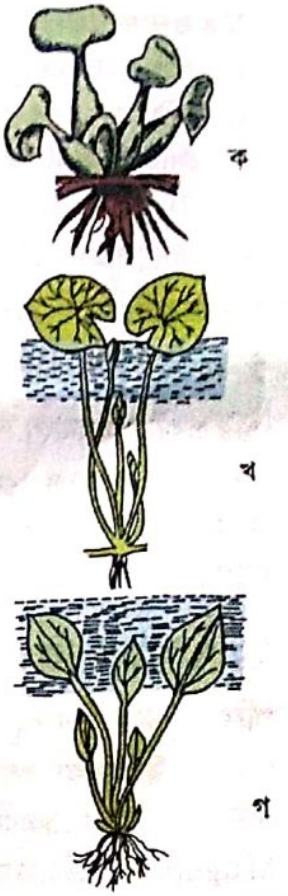

চিত্র-১২.৩: ক. মুক্তভাসমান, খ. মূলাবদ্ধ ভাসমান, গ. মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত

আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে জলজ উদ্ভিদগুলো মোট ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free Floating Hydrophytes) : যেসব জলজ উদ্ভিদের সম্পূর্ণ দেহ পানিতে ভাসমান এবং পানির স্রোত বা বাতাসের কারণে স্থানান্তরিত হয় তারা মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। যেমন- কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), টোপাপানা (*Pistia stratiotes*) ইত্যাদি (চিত্র-১২.৩: ক)।

২. মূলাবদ্ধ পত্রভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted Floating Hydrophytes): যে সকল উদ্ভিদের পত্রফলক পানির উপরে ভাসমান থাকলেও মূল মাটিতে আবদ্ধ থাকে তারা মূলাবদ্ধ পত্রভাসমান জলজ উদ্ভিদ। যেমন– শাপলা (*Nymphaea pubescens*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) ইত্যাদি (চিত্র-১২.৩: খ)।

৩. মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted Submerged Hydrophytes): যে সকল জলজ উদ্ভিদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত এবং মূলের সাহায্যে মাটির সাথে আবদ্ধ থাকে তারা মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ। যেমন- পানিকলা (*Ottelia alismoides*), পাতা ঝাঁঝি (*Potamogeton nodosus*) (চিত্র-১২.৩: গ)।

৪. মুক্ত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Free Submerged Hydrophytes): যে সকল জলজ উদ্ভিদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত কিন্তু মূলের সাহায্যে মাটির সাথে আবদ্ধ থাকে না তারা মুক্ত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ। যেমন– ঝাঁঝি (*Ceratophyllum demersum*), নাজা (*Naja*) ইত্যাদি (চিত্র-১২.৪: ক)।

৫. মূলাবদ্ধ উত্থিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted Emergent Hydrophytes): যেসব উদ্ভিদের মূল পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ থাকে এবং দেহকাণ্ড আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পানির উপরে থাকে তারা মূলাবদ্ধ উত্থিত জলজ উদ্ভিদ। যেমন— কেশরদাম (*Ludwigia repens*), কলমিলতা (*Ipomoea aquatica*) ইত্যাদি (চিত্র-১২.৪: খ)।

চিত্র-১২.৪: ক. মুক্ত নিমজ্জিত, খ. মূলাবদ্ধ উত্থিত

১২.৯.১ জলজ উদ্ভিদের অভিযোজনসমূহ (Adaptation of Aquatic Plants)

ক. অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological Adaptation)

১. জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত নয়। এদের মূল সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। মূলে মূলরোম থাকে না কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের প্রয়োজন পড়ে না। অনেক উদ্ভিদে (গুঁড়িপানা-*Wolffia*) আবার মূলই থাকে না।

২. উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করার জন্য কিছু উদ্ভিদে অস্থানিক ভাসমান মূল (কেশরদাম-*Jussiaea repens*) তৈরি হয়।

৩. জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নমনীয় ও স্পঞ্জী। প্রচুর বায়ুকুঠুরীর উপস্থিতি এদের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

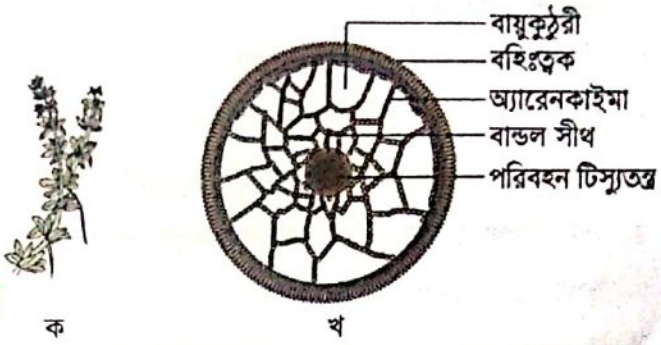

চিত্র-১২.৫: ক. মূলবিহীন জলজ উদ্ভিদ
খ. কাণ্ডের অন্তর্গঠন

৪. পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম, তাই পানির টানে ছিঁড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত (যেমন-কচুরিপানা) যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

৫. প্রজাতিভেদে পাতা বিভিন্ন আকৃতির হয়। অনেক সময় মোমে আবৃত। কখনোবা প্রকাণ্ড। যেমন **আমাজন লিলির** পাতা এতো চওড়া যে একটি ছোট্ট শিশুকে ধারণ করতে পারে।

৬. নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের পাতা আলোর জন্য ভেদ্য হয়।

খ. অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical Adaptation)

১. জলজ উদ্ভিদের ত্বকে সাধারণত কিউটিকল থাকে না, অথবা থাকলেও তা খুবই পাতলা প্রকৃতির। কারণ এদের পানির অপচয় রোধের প্রয়োজন হয় না।

২. পাতা ও কাণ্ডের অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। এগুলো বায়ু ধরে রাখে এবং উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

৩. নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদে যান্ত্রিক টিস্যু সাধারণত থাকে না, তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।

৪. নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাই সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৫. উদ্ভিদের নিমজ্জিত অংশে স্টোমাটা অনুপস্থিত, কারণ কোষপ্রাচীর দিয়ে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে।

৬. পরিবহন টিস্যু থাকে না বা থাকলেও তা সুগঠিত নয়, কারণ পানি পরিবহনের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

গ. শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological Adaptation)

১. পানির নিচে কম আলোতে ও কম CO_2-যুক্ত পরিবেশে সঠিকভাবে সালোকসংশ্লেষণের জন্য এদের কাণ্ড ও পাতার ত্বকে ক্লোরোফিল থাকে।

২. অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)।

৩. ত্বকে কিউটিকল না থাকায় সব অঙ্গ দিয়ে পানি শোষণ করতে পারে। পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের প্রয়োজন হয় না।

৪. কাণ্ড ও পাতার বায়ুকুঠুরীতে বাতাস জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।

৫. প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয় না।

CamScanner

১২.১০ জলজ প্রাণীর অভিযোজনসমূহ (Adaptation of Aquatic Animal)

১. অধিকাংশ জলজ প্রাণীর দেহ লম্বাটে এবং পিচ্ছিল। এদের মাথা ও লেজ অংশ ক্রমান্বয়ে সরু এবং মধ্যাংশ চওড়া যাতে চলাচলে সুবিধা হয়।

২. পানিতে ভেসে থাকার জন্য বায়ুথলি (পটকা) থাকে। এছাড়া পাখনাগুলো সাঁতার কাটতে সুবিধা প্রদান করে।

৩. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য এদের ফুলকা থাকে।

৪. চোখের উপর পর্দা থাকে, যা স্থায়ীভাবে চোখকে সুরক্ষা দেয়।

৫. গৌণ জলজ প্রাণীদের বৃহদাকৃতির ফুসফুস থাকে যাতে প্রচুর বাতাস জমা করে রাখে এবং বহুক্ষণ পরপর এরা পানির উপরে উঠে আসে এবং শ্বাস গ্রহণ করে।

পাঁচটি জলজ প্রাণীর নাম: রুই মাছ, ইলিশ মাছ, কাতল মাছ, তিমি এবং শুশুক।

বাড়ির কাজ

মিঠা পানির জলজ উদ্ভিদের অভিযোজনের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

পাঠ ৪

জীবের অভিযোজন: মরুজ পরিবেশে অভিযোজন
Adaptation of Organisms: Desert Adaptation

১২.১১ মরুজ উদ্ভিদ (Xerophytes)

যে মাটিতে পানির পরিমাণ খুব কম, এমন শুষ্ক মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের মরুজ উদ্ভিদ বলে। ওপেনহেইমার (Oppenheimer) এর মতে, যেসব উদ্ভিদ পরিবেশে পানির অভাব সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করতে পারে, আয়ত্ত করার জন্য নিজেদের দেহের অঙ্গসংস্থান, শরীরস্থান এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে বসবাস করে তারাই মরুজ উদ্ভিদ।

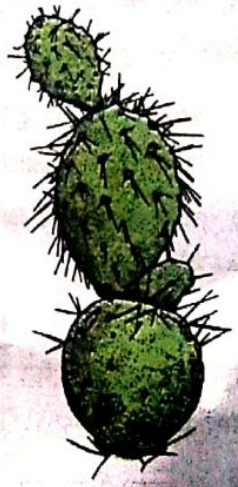

চিত্র-১২.৬: মরুজ উদ্ভিদ ফণীমনসা

১২.১১.১ মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজনসমূহ (Adaptation of Xerophytes)

মরুজ উদ্ভিদের কিছু সাধারণ অভিযোজন বিদ্যমান। সেগুলো নিম্নরূপ—

ক. বাহ্যিক/অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological Adaptation)

১. মরুভূমির বালি ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করার লক্ষ্যে মরুজ উদ্ভিদগুলো সাধারণত আকারে ছোট ও ঝোপযুক্ত হয়ে থাকে।

২. মরু পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বা পানি ধরে রাখার জন্য এসকল উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড চাপা, রসালো ও সবুজ হয়ে থাকে।

৩. মূল মাটির গভীরে অথবা মাটির উপরিতলের কাছাকাছি থাকে। ফলে এরা মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানি বা বৃষ্টির সামান্য পানি দ্রুত মাটির উপরিতল থেকে শোষণ করে বেঁচে থাকে।

৪. পানির অপচয় রোধের জন্য এদের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট, পুরু বা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।

CamScanner

৫. মরুজ উদ্ভিদের মূলে সুগঠিত মূলরোম এবং মূলত্র থাকে।

৬. কাণ্ড সাধারণত রোম বা মোমের আবরণে আবৃত থাকে।

৭. কোনো কোনো মরুজ উদ্ভিদের পাতা গুটানো বা ভাঁজ করা থাকে।

খ. অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical Adaptation)

১. রসাল কাণ্ডের হাইপোডার্মিসে পানি সঞ্চয়কারী কলা থাকে এবং ত্বকের কোষে মিউসিলেজ থাকে। ফলে খরায় উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে না।

২. পত্ররন্ধ্র ত্বকের গভীরে লুকানো থাকায় পানির বাষ্পায়ন ও নিঃসরণ কম হয়।

৩. প্যারেনকাইমা কোষ স্ফীতিশীল ও রসালো, তাই প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে।

> **জেনে রাখো**
>
> *Aloe vera* (ঘৃতকুমারী), *Calotropis procera* (আকন্দ), *Opuntia dillenii* (ফণীমনসা), *Asparagus racemosus* (শতমূলী) ইত্যাদি হলো কতিপয় মরুজ উদ্ভিদের নাম।

৪. মরুজ উদ্ভিদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট, তাই পানির অপচয় রোধ হয়।

৫. এদের পরিবহন ও যান্ত্রিক কলা খুবই সুগঠিত, লিগনিনযুক্ত ও ঘন সন্নিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ, পানি ধরে রাখা এবং গাছকে সহিষ্ণু করার কৌশল।

৬. পাতার মেসোফিল কলা পেলিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় বিভেদিত এবং এতে কোষান্তরকাশ খুবই কম।

গ. শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological Adaptation)

১. পাতায় পত্ররন্ধ্র নিমজ্জিত বা লুকায়িত হওয়ায় প্রস্বেদন হার হ্রাস পায়।

২. পাতা কণ্টকে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রস্বেদন হার কমে যায়। ফলে পানির অপচয় রোধ হয়।

৩. ত্বক পুরু হওয়ায় মরুজ উদ্ভিদের প্রস্বেদন হ্রাস পায়।

৪. মরুজ উদ্ভিদদেহে পানি স্বল্পতার কারণে এনজাইমের কার্যকারিতা কম হয়, ফলে তাদের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে।

৫. কোষরসের ঘনত্ব অধিক হওয়ায় এদের কাণ্ড ও পাতা শুকাতে পারে না।

১২.১২ মরুজ প্রাণীর অভিযোজন (Adaptation of Desert Animals)

মরুবাসী প্রাণীদের মধ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজনগুলো পাওয়া যায়—

১. মরুজ প্রাণীগুলো রসালো উদ্ভিদ বা শিকারীর দেহ থেকে পানি সংগ্রহ করে এবং কোনো কোনো প্রজাতি বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় পানি উৎপাদন করে। যেমন— সঞ্চিত শর্করা, চর্বি, প্রোটিন থেকে পানি তৈরি করে।

২. দেহে পানি প্রতিরোধক আবরণ থাকে। অপরদিকে ঘর্মগ্রন্থি খুব কম থাকে। যেমন- মরু গিরগিটির (*Moloch horridus*) চামড়া পুরু এবং কাঁটাযুক্ত।

৩. অনেকেই খুব দ্রুত গতির হয় এবং এজন্য পা বা পায়ের তলা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত। যেমন- উটের পায়ের তলা চওড়া প্যাডযুক্ত।

৪. রৌদ্র তাপ এড়ানোর জন্য এদের অধিকাংশই নিশাচর।

৫. আত্মরক্ষার জন্য নাক ও কানের ছিদ্রের উপর লোম বা কপাটিকা তথা আবরণ থাকে। কারো দেহ আঁশে আবৃত। আবার অনেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বিষ তৈরি করে। যেমন- *Tarantula* নামক মাকড়সা।

CamScanner

পাঠ ৫

জীবের অভিযোজন: লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন
Adaptation of Organisms: Salt or Brackish Water Adaptation

১২.১৩ লোনামাটির উদ্ভিদ (Halophytes)

যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ততা এবং পানিবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এবং লবণাক্ত মাটিতে সুন্দরভাবে জন্মায় ও বিস্তার লাভ করে তাদের লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট বলে। যেমন- সুন্দরী (*Heritiera fomes*)।

লোনা মাটির উদ্ভিদে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান—

১. অধিকাংশ উদ্ভিদ গুল্ম জাতীয়, আর কিছু বীরুৎ। গুল্ম প্রজাতিগুলো ব্যাপক শাখাযুক্ত ঝোপাকার।
২. এদের সাধারণত ঠেসমূল ও স্তম্ভমূল থাকে।
৩. লোনামাটির অনেক উদ্ভিদে শ্বাসমূল (pneumatophore) সৃষ্টি হয়।
৪. অনেক সদস্য মরুজ স্বভাব বহন করে। যেমন- কাণ্ড রসালো, পাতা পুরু ও মাংসল অথবা পাতাবিহীন।
৫. মূলের অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠরি থাকে।
৬. অনেক সদস্যে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ঘটে।
৭. লোনামাটির উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।
৮. এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং অভিস্রবণিক চাপ বেশি থাকে।

১২.১৩.১ লোনামাটির উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Halophytes)

লোনা পরিবেশের উদ্ভিদে নিম্নলিখিত অভিযোজনগুলো দেখা যায়। যেমন—

১. লোনামাটির উদ্ভিদ সাধারণত পানি বিধৌত নরম ও কাদা মাটিতে জন্মে তাই গাছগুলোর উচ্চতা কম এবং অধিকাংশই গুল্ম স্বভাবের।
২. এদের মূল বেশি গভীরে প্রবেশ করে না। তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য এদের **স্তম্ভমূল** ও **ঠেসমূল** হয়।
৩. মাটিতে লবণাক্ত পানি থাকায় সে মাটিতে মুক্ত অক্সিজেন কম থাকে। এমন পরিবেশে কিছু শাখা-প্রশাখা মূল মাটির উপরে উঠে আসে এবং **শ্বাসমূল** গঠন করে।
৪. অধিক লোনা পানি এরা সাধারণত শোষণ করে না। বরং বর্ষা ঋতুতে হালকা লোনা পানি উদ্ভিদ দেহে সঞ্চয় করে রাখে। এজন্য অনেক প্রজাতির কাণ্ড ও পাতা রসালো।

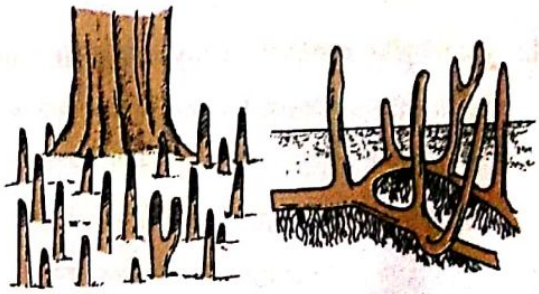

চিত্র-১২.৭: শ্বাসমূল

৫. অধিকাংশ প্রজাতিতে পাতা পুরু, মাংসল ও রসালো। কখনও পাতা অনুপস্থিত।
৬. মূলের অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠরি থাকে, যেখানে পর্যাপ্ত গ্যাস সঞ্চয় করে রাখে।
৭. এপিডার্মিসের উপরে পুরু কিউটিকল, লুকানো পত্ররন্ধ্র এবং পর্যাপ্ত যান্ত্রিক টিস্যু থাকে।
৮. কোষরসে অভিস্রবণীয় চাপ অত্যন্ত বেশি।
৯. প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটার কারণে ফল ও বীজ পানিতে ধুয়ে চলে যায়। সে কারণে অনেকের **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম** ঘটে।

১২.১৪ লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন (Adaptation of Salt Water Animals)

১. কিছু প্রাণী বাইরের পরিবেশে লবণের ঘনত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহের ভিতরে লবণের ঘনত্ব পরিবর্তন করে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে।
২. মাছ গিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত লবণ এবং সামুদ্রিক পাখি লবণ গ্রন্থির মাধ্যমে অতিরিক্ত লবণ দেহ থেকে বের করে দেয়।
৩. তিমি সামুদ্রিক পানি বিপাকীয় কাজে ব্যবহার না করে খাদ্যের নির্যাস থেকেই শুধু বিপাকীয় পানির চাহিদা পূরণ করে।
৪. তিমির মতো সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীরা দীর্ঘসময় পরপর পানির উপরে উঠে আসে এবং প্রচুর অক্সিজেন সংগ্রহ করে জমা করে রাখে।
৫. গভীর সমুদ্রের প্রাণীরা অনেকে নিজে আলো বিচ্ছুরণ করে। কিছু প্রাণী দেহে আলো উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া ধরে রাখে অথবা ইকোলোকেশন পদ্ধতিতে অন্ধকারে আহার বা শিকার খুঁজে বেড়ায়।

শ্রেণির কাজ

হ্যালোফাইটিক উদ্ভিদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ করে শিক্ষককে দেখাও।

CamScanner

পাঠ ৬

বায়োম: স্থলজ বায়োম
Biome: Terrestrial Biome

১২.১৫ বায়োমের ধারণা (Concept of Biome)

পৃথিবীতে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী কোথায় জন্মাবে তা অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভর করে। কারণ জীবের সাথে জীবের, জীবের সাথে জড় মাধ্যম এবং পরিবেশের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উপাদানের সবসময় আন্তঃক্রিয়া পরিচালিত হয়। এমন আন্তঃক্রিয়ার ফলে যে উদ্ভিদ বা প্রাণী যেস্থানের জন্য উপযুক্ত হবে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণী সেখানেই জন্মাবে। জীবের সাথে জড় মাধ্যমের ও পরিবেশের এ আন্তঃক্রিয়া বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নামে পরিচিত। ইকোসিস্টেমকে যখন বিশ্বমাত্রায় প্রকাশ করা হয় তখন একে বায়োম বলে। প্রতিটি বায়োমের সাধারণ প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মাটির বৈশিষ্ট্য, পরিবেশীয় বাধা (যেমন- পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বড় হ্রদ, মরুভূমি প্রভৃতি) ইত্যাদির উপর। **প্রধানত ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান উদ্ভিজ্জ মিলিতভাবে এক একটি বায়োম গঠন করে থাকে। অতএব নির্দিষ্ট পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বৃহদাকৃতির ভৌগোলিক এককে বায়োম বলে।**

তবে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বায়োমের যেমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটে তেমনি স্থানচ্যুতিও ঘটে।

বায়োমকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- স্থলজ ও জলজ বায়োম।

১২.১৬ স্থলজ বায়োম (Terrestrial Biome)

যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত তাদের স্থলজ বায়োম বলে। জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং অবস্থানের ভিত্তিতে স্থলজ বায়োম বিভিন্ন প্রকার—

১২.১৬.১ তুন্দ্রা বায়োম (Tundra Biome)

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তরের, বৃক্ষহীন এবং তুষারাবৃত অঞ্চল নিয়ে তুন্দ্রা বায়োম গঠিত। এটার বিস্তার সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা ও উত্তর মেরু অঞ্চল যা স্থলভাগের প্রায় এক দশমাংশ।

পরিবেশ: চরম শীত ও ঠান্ডা (গড় তাপমাত্রা- ৩৪° সে.) আবহাওয়ার কারণে বছরের দীর্ঘ সময় বরফে ঢাকা থাকে। ৬-৮ সপ্তাহ গ্রীষ্মকাল (গড় তাপমাত্রা ৩-১২°সে.) এবং তখন উপরের কিছু বরফ গলে ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫ সে. মি. যা বরফ হিসেবে পড়ে। উদ্ভিদের জীবনকাল অতি সংক্ষিপ্ত। মৃতজীবদেহ পুষ্টির প্রধান উৎস, যা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ। তুন্দ্রা বায়োম ২টি অংশে বিভক্ত; যেমন-উত্তরে সমভূমির মেরু (arctic) তুন্দ্রা এবং পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে গঠিত আলপাইন (alpine) তুন্দ্রা।

উদ্ভিদ: মাটি অনুর্বর এবং উষর হওয়ায় এখানে জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত কম। এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ ঘাস, মস, লাইকেন, ছোট গুল্ম এবং ছোট বৃক্ষ। তবে প্রধান উদ্ভিদ হলো রেইনডিয়ার মস নামক লাইকেন।

প্রাণী: এখানে প্রাণী খুব কম। বেশি ঠান্ডার জন্য উভচর, সরীসৃপ ও মাছ নাই অথবা খুব কম। এখানে প্রধানত উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী এবং গ্রীষ্মকালে কিছু যাযাবর পাখি দেখা যায়। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বলগা হরিণ, খরগোস, খেঁকশিয়াল, মেরুভল্লুক, নেকড়ে, কার্বো প্রধান। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, লুনা, হাঁস, বাজপাখি, জিগার, স্যান্ড পাইপার, পেঁচা প্রধান। গ্রীষ্মকালে কিছু মশা ও মাছির আগমন ঘটে। অমেরুদণ্ডীর মধ্যে শামুক, জোঁক, জলজ বিটল ও মিজ লার্ভা উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিদেহ লম্বা ও ঘন লোমে আবৃত। চামড়ার নিচে ৬" পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং প্রায় সব প্রাণীর রক্ত সাদা।

১২.১৬.২ তৃণভূমির বায়োম (Grassland Biome)

পৃথিবীর যে অঞ্চলে প্রধানত ঘাস জন্মে কিন্তু বড় গুল্ম বা বৃক্ষ জন্মে না তেমন এলাকা নিয়ে তৃণভূমির বায়োম গঠিত। বিভিন্ন মহাদেশের পূর্বাংশ নিয়ে তৃণভূমির বায়োম গঠিত। যেমন- মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়ার দক্ষিণাংশ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপের তৃণভূমিকে প্রেইরি (prairie) বলে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী তাপমাত্রা ও তৃণের পার্থক্যের ভিত্তিতে তৃণভূমির বায়োমকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাভানা (tropical savanna) এবং শীতপ্রধান তৃণভূমি (temperate grassland) নামক ২টি অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

CamScanner

পরিবেশ: এখানে ২৫-৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। সে কারণে এখানে যেমন ব্যাপক বনভূমি নাই তেমনি প্রকৃত মরুভূমিও নাই। মাটি হিউমাসসমৃদ্ধ, দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীতে তাপমাত্রা ১৫° সে. এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে ৩২° সে. এর উপরে ওঠে।

উদ্ভিদ: ঘাস এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। বড় ঘাস ১২ থেকে ১৫ সে. মি. লম্বা হয়। এরা গুচ্ছাকারে জন্মায়। যব, গম, রাই ভালো জন্মে। বৃক্ষ ও গুল্ম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ অঞ্চলকে পৃথিবীর চারণ ভূমি বলে।

প্রাণী: তৃণভূমি অত্যন্ত উৎপাদনক্ষম তাই বেশি সংখ্যক প্রাণী ধারণ করে থাকে। প্রধান প্রাণী হলো বাইসন, এন্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, ঘোড়া, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি তৃণভোজী। এদের ভক্ষক হলো সিংহ, হায়না ও খেঁকশিয়াল। অধিকাংশ প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। কীট-পতঙ্গের মধ্যে উইপোকা, পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং, মৌমাছি, মাছি, প্রজাপতি ও এদের খাদক হিসেবে পাখি, সাপ, টিকটিকি, ব্যাঙ বাস করে।

১২.১৬.৩ সাভানা বায়োম (Savanna Biome)

ক্রান্তীয় তৃণভূমিকে সাভানা বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ক্রান্তীয় তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে সাভানা রয়েছে। মধ্য আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় সাভানা রয়েছে (৫ মিলিয়ন বর্গ মাইল)।

পরিবেশ: সাভানায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল দেখা যায়। এখানে কম বৃষ্টিপাত, দীর্ঘ শুষ্ককাল থাকে এবং জলবায়ু উষ্ণ। এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সে.মি. (৪০-৬০ ইঞ্চি), যা ৬-৮ মাস ধরে চলে। মাটিতে পাতলা হিউমাস থাকে, তবে ব্যাপক ছিদ্রযুক্ত। তাই বৃষ্টির পানি সহজেই নিচে চলে যায়।

উদ্ভিদ: সাভানা একপ্রকার তৃণভূমি হলেও এদের মাঝে মাঝে বৃক্ষ বা ঝোপ জাতীয় গাছ থাকে। যেমন- বাবলা, ইউফরবিয়া এবং কিছু তালজাতীয় গাছ। তবে মৌসুমী বজ্রপাত থেকে সৃষ্ট আগুন এর জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে রাখে।

প্রাণী: নানা প্রকার এন্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, মহিষ, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা, হাতি প্রধান। ছোট প্রাণীর মধ্যে সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, উই পোকা, গুবরে পোকা প্রধান।

১২.১৬.৪ মরুভূমির বায়োম (Desert Biome)

মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০ সে. মি. এর কম এবং বাষ্পায়ন বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি। সবচেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, এশিয়ার গোবি ও আরবের মরুভূমি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মরুভূমি আছে, যা মোট পৃথিবী পৃষ্ঠের ১/৫ ভাগ।

পরিবেশ: এটা অতি উত্তপ্ত অঞ্চল যেখানে স্থায়ী বা সাময়িক প্রবাহিত কোনো জলাশয় নেই। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫ সে. মি. এর কম। দিন ও রাতের তাপমাত্রা ৩০° সে. পর্যন্ত পার্থক্য হতে পারে। কারণ এখানে জলীয়বাষ্প নেই। মাটিতে জৈব পুষ্টি খুব কম বা অনুপস্থিত। মাটিতে প্রচুর পুষ্টি থাকলেও পানির খুব অভাব।

উদ্ভিদ: মরুভূমিতে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ জন্মে। বর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল খুব সীমিত আর বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদগুলোতে পানির অপচয় রোধের ব্যবস্থা আছে। এদের বৃদ্ধিও খুব কম। এসব এলাকার প্রধান উদ্ভিদ হলো ক্যাকটাস, কিছু ইউফরবিয়া, কিছু কম্পোজিটি ও কিছু লিগুম। এছাড়া বাবলা ও খেজুর জাতীয় গাছ জন্মে।

প্রাণী: মরুভূমিতে প্রাণীর সংখ্যা কম হলেও বিচিত্র ধরনের। যেমন- স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, জ্যাক র‍্যাবিট, ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর, খেঁকশিয়াল প্রধান। সরীসৃপ মরুভূমিতে সমৃদ্ধ যেমন-হর্ণ লিজার্ড, গিলা মনস্টার, কোরাল সাপ, র‍্যাটল সাপ ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে উটপাখি, এমু, টার্কি, শকুন, দাড়কাক, মধু পাখি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিছা, কাঁকড়া বিছা, ট্যারান্টুলা মাকড় দেখা যায়। মরুভূমির প্রাণীরা রাত্রিতে বেশি চলাচল করে।

১২.১৬.৫ বনভূমি বায়োম (Forest Biome)

পৃথিবী পৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। এটা বৃষ্টিপাতবহুল এলাকা হওয়ায় প্রধান জীবগোষ্ঠী হলো বৃক্ষ এবং অন্যান্য কাষ্ঠল উদ্ভিজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি বায়োম বিভিন্ন প্রকার :

i. **গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী বনাঞ্চল (Tropical Rain Forest):** আমাজান নদীর অববাহিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ২য় বৃহত্তম বনভূমি দুটি অবস্থিত। এছাড়া আফ্রিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা ও ফিলিপাইনে এ ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে।

পরিবেশ: এখানকার তাপমাত্রা গড়ে ২০-২৫° সে.। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫০-৪৫০ সে. মি. যা সারা বছরই হয়, তবে বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত বেশি। সে কারণে মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেতে থাকে। চিরসবুজ বড় বড় বৃক্ষ থাকায় বনের তলদেশ অন্ধকার ও ঠান্ডা। মাটিতে পুষ্টি কম ও অম্লীয়।

উদ্ভিদ: বিভিন্ন ধরনের উচ্চ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে জন্মে এবং একক কোনো প্রজাতি আধিপত্য বিস্তার করে না। এমন বনে প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশি। অধিকাংশই চিরসবুজ তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। বৃক্ষগুলো ২-৩ স্তরে ক্যানোপি গঠন করে। বৃক্ষের সাথে অনেক কাষ্ঠল লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ জন্মে। এছাড়া, ফার্ন, মস ও তালজাতীয় গাছ জন্মে।

প্রাণী: এ বন প্রাণী বৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। এর মধ্যে বানর, পাখি, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, শামুক, জোঁক, বিছা, মথ, পিঁপড়া, উইপোকাসহ নানা প্রকার পতঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

ii. **কনিফার বনাঞ্চল (Coniferous Forest):** কনিফার জাতীয় নগ্নবীজী উদ্ভিদ এ বনের প্রধান উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। ক্যালিফোর্নিয়ার রেড উড বনভূমি এর অন্যতম। উত্তর আমেরিকা, উত্তরপূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ এবং সুউচ্চ পর্বতগুলোতে কনিফার বনাঞ্চল আছে।

পরিবেশ: এখানে দীর্ঘ শীতকাল ও সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকাল থাকে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সে. মি.। তাপমাত্রা —৩০°সে. হতে ৩০° সে.। মাটি পাতলা, উর্বর এবং লিটার সমৃদ্ধ, তাই অম্লীয়।

উদ্ভিদ: এখানকার প্রধান উদ্ভিদ কনিফার জাতীয় বৃক্ষ। যেমন- পাইন, স্প্রুস, ফার, রেডউড, হেমলক প্রভৃতি, যার অধিকাংশই চিরসবুজ। এদের মাঝে উপগুল্ম খুব কম জন্মে।

প্রাণী: কালো ভল্লুক, শিয়াল, সিংহ, নেকড়ে, রেড হরিণ ও চমরী গাই, চড়াই, ফিঞ্চসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, লাল কাঠবিড়ালী, ইঁদুর এবং অসংখ্য প্রজাতির কীটপতঙ্গ এখানে জন্মে। কিছু সরীসৃপ প্রাণীও আছে।

iii. **পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous Forest):** এমন বনের অধিকাংশ প্রজাতির পাতা শীতের শুরুতে ঝরে যায়। তাই এগুলো পর্ণমোচী বন নামে পরিচিত। আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায় এমন বনভূমি আছে।

পরিবেশ: এখানে বছরে ১০০ থেকে ১৮০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। মেঝেতে প্রচুর লিটার জমা থাকে কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদের শীতের শুরুতে পাতা ঝরে যায়। যে অঞ্চলে তুষারপাত ঘটে তাকে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বন আর যেখানে তুষারপাত ঘটে না তাকে আর্দ্র পর্ণমোচী বন বলে। বাংলাদেশের শালবন আর্দ্র পর্ণমোচীর উদাহরণ।

উদ্ভিদ: পর্ণমোচী বনে বীচ, ওক, ম্যাপল, হিকোরি, বার্চ, চেস্টনাট, শাল, পলাশ গাছ জন্মে। বৃষ্টিবহুল হওয়ায় বড় বৃক্ষের নিচে গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। এমন বনে শীত ও গ্রীষ্মে চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

প্রাণী: বিচিত্র ধরনের প্রাণী এসব বনে দেখা যায়। যেমন- হরিণ, ভল্লুক, খেকশিয়াল, কাঠবিড়ালী, বনবিড়াল, উট, উভচর প্রাণী, বিভিন্ন ধরনের ছোট পাখি, শিকারী পাখি, কীটপতঙ্গ ও নানা ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের অনেকেই আবার গর্তে বাস করে।

iv. **ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove Forest):** এমন বনাঞ্চল ৩২° উ. এবং ৩০° দ. এর মধ্যবর্তী উপকূলীয় গড়ান অঞ্চলে জন্মে। বাংলাদেশের সুন্দরবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন বন আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আছে।

পরিবেশ: প্রাত্যহিক জোয়ার ও ভাটার কারণে মাটি সিক্ত, কর্দমাক্ত এবং অধিক লবণযুক্ত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৬০-২০০ সে. মি.। তবে বনভূমি তেমন সমৃদ্ধ নয়।

উদ্ভিদ: এমন পরিবেশে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ দেখা যায়। যেমন- শ্বাসমূল, জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, স্তম্ভমূল ও ঠেসমূল এবং রসাল দেহ এ বনাঞ্চলের উদ্ভিদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, কাকড়া, গরান, খামো, কেওড়া, গেওয়া, বাইন, হিতল, গোলপাতা প্রধান। এছাড়া কেয়া, ছাগলখুর লতা, টাইগার ফার্ন, বোরা, পশুর বিভিন্ন প্রকার আরোহী লতা উল্লেখযোগ্য।

প্রাণী: এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, বানর, চিত্রা হরিণ, বন্য শূকর, কুমির, নানা ধরনের শামুক, সাপ ও পাখি এবং কীটপতঙ্গ।

শ্রেণির কাজ

পৃথিবীর সকল স্থলজ বায়োমে বসবাসরত উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা ছক আকারে উপস্থাপন করো।

CamScanner

পাঠ ৭

বায়োম: জলজ বায়োম
Biome: Water Biome

১২.১৭ জলজ বায়োম (Water Biome)

পৃথিবীপৃষ্ঠের জলময় নিবাসের বায়োমগুলো একত্রে জলজ বায়োম নামে পরিচিত। পানিতে দ্রবীভূত আয়নের ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে জলজ বায়োম প্রধানত দু'প্রকার। যথা- স্বাদু পানির বায়োম ও লবণাক্ত পানির বায়োম।

১২.১৭.১ স্বাদু পানির বায়োম (Fresh Water Biome)

পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ স্বাদু পানির বায়োম দ্বারা আবৃত। এগুলো বিচ্ছিন্ন, ছোট এবং অগভীর। স্বাদু পানির বায়োম কয়েক প্রকার হয়ে থাকে—

১. **নদী (River):** নদীতে একমুখী স্রোত থাকে। ঝর্না, হিমবাহ বা হ্রদ থেকে নদীর উৎপত্তি হয়।
পরিবেশ: নদীর উৎসমুখে প্রচুর নুড়ি পাথর থাকে। সেখানে পানির স্রোত বেশি, তাপমাত্রা কম, পানি স্বচ্ছ এবং প্রচুর অক্সিজেন থাকে। মাঝামাঝি সমতল অঞ্চলে চওড়া। শেষ দিকে পানিতে প্রচুর পলি থাকায় ঘোলাটে হয়।
উদ্ভিদ: মাঝামাঝি সমতল অংশে প্রচুর শৈবাল ও সবুজ উদ্ভিদ জন্মে।
প্রাণী: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাছ প্রধান। স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক আর সরীসৃপের মধ্যে কুমির, ঘড়িয়াল, কাছিম, সাপ প্রভৃতি অন্যতম।

২. **জলাভূমি (Wet-Lands):** রামসার কনভেনশন (১৯৭১) অনুসারে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত জলাভূমি টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন। এছাড়া সারা দেশে প্রচুর ছোট-বড় জলাভূমি আছে।
পরিবেশ: এগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী, লোনাপানি বা মিঠাপানির জলাধার। এদের স্রোত থাকে বা বদ্ধ জলাশয়।
উদ্ভিদ: বিশ্বে জলাভূমিতে ৫,০০০ এর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে আর বাংলাদেশে এর সংখ্যা ১৫৪টি। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জলজ উদ্ভিদ হলো মাখনা, পানিফল, শাপলা, পদ্ম, হোগলা, অ্যাজোলা, স্যালভিনিয়া, কচুরিপানা প্রভৃতি।
প্রাণী: ৭৫০ প্রজাতির পাখি, ৭৬০ প্রজাতির মিঠাপানি ও লোনা পানির মাছ, শামুক, ঝিনুক, সাপ, বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণী বাস করে।

৩. **হ্রদ ও পুকুর (Lakes and Ponds):** এমন জলাশয়ের আয়তন কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত। এদের গভীরতায়ও ব্যাপক পার্থক্য আছে। অনেক পুকুর বসন্তকালে শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতা ব্যাপক (বৈকাল হ্রদ ৪৭৪২ ফুট) এবং স্থায়ী জলাধার। গভীর হ্রদগুলোতে আনুভূমিক ৩টি অঞ্চল থাকে।
লিটোরাল অঞ্চল: এটা হ্রদের কিনারার উষ্ণ অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, মূলাবদ্ধ ও ভাসমান উদ্ভিদ জন্মে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, ক্লামস্, পতঙ্গ, ক্রাস্টাশিয়ান, মাছ এবং উভচর প্রাণী থাকে। পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন ফ্লাই এবং মিজেস প্রধান। এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো ডাহুক, সাপ ও কচ্ছপের খাদ্য।
লিমনেটিক অঞ্চল: হ্রদের উপরের মুক্ত অঞ্চল। এ অঞ্চল আলোকিত এবং এখানে প্রধানত ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন থাকে। এছাড়া বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার মাছ এখানে থাকে।
প্রোফান্ডাল অঞ্চল: হ্রদের নিচে ক্ষীণ আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায়। এ অঞ্চলের পানি ঠান্ডা এবং বেশি ঘন। এখানকার প্রাণীগুলো মৃতদেহ ভক্ষণ করে।

১২.১৭.২ লোনা পানির বায়োম (Saline Water Biome)

মহাসাগর, সাগর, মোহনা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৩/৪ ভাগ দখল করে আছে। এজন্য এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং প্রথম বায়োম। সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ পিপিএম এবং pH ৪। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা ২৭°সে. আর মেরু অঞ্চলে ৩°সে.। সাগরের চারটি অঞ্চলেই ব্যাপক জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

১. **গড়ান অঞ্চল (Intertidal Zone):** এ অঞ্চলটি যেহেতু প্রতিদিন দু'বার জোয়ার ও ভাটায় প্লাবিত হয় তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। উপরের অংশে কয়েকটা প্রজাতির ডায়াটম, বাদামি শৈবাল, লোহিত শৈবাল ও কিছু সবুজ শৈবাল জন্মে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, ক্লাবস্, সি-স্টার ও ছোট ছোট মাছ থাকে। এছাড়া ক্রাস্টাশিয়ান ও মোলাস্কা থাকে।

CamScanner

২. **পেলাজিক অঞ্চল (Pelagic Zone):** সাগরের পৃষ্ঠীয় মুক্ত অঞ্চলকে বোঝায়। এ অঞ্চলে আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। পাশাপাশি প্রচুর প্লাংকটন থাকে। প্রাণীর মধ্যে নানা প্রকার মাছ, হাঙর, ডলফিন, তিমি থাকে।

৩. **বেনথিক অঞ্চল (Benthic Zone):** পেলাজিকের নিচে স্বল্প আলো বা আলোহীন অঞ্চল, যেখানে বালু, নুড়ি এবং মৃতদেহ থাকে। এখানে মূলত সামুদ্রিক আগাছা, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, স্পঞ্জ, সি-স্টার মাছ থাকে।

৪. **এবিসাল অঞ্চল (Abyssal Zone):** এটা সমুদ্রের গভীরতম স্থান যেখানে তাপমাত্রা প্রায় ৩°সে.। উচ্চচাপ এবং প্রচুর অক্সিজেন থাকে কিন্তু পুষ্টি খুব কম। এখানে অনেক অমেরুদণ্ডী মাছ, কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া থাকে।

একক কাজ

সাগরের অঞ্চলে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ৮ প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল
Zoogeographical Regions

১২.১৮ প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoogeographical Regions)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল এক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত। মাটির প্রকৃতি, ভূ-সংস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ে ব্যাপক ভিন্নতার কারণেই এমন বৈচিত্র্য। প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র চরিত্রের সাথে ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আরো মজার ব্যাপার হলো কোটি কোটি বছর পূর্বে মহাদেশগুলোর অবস্থান এক সাথে থাকলেও তা ক্রমশ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। **ওয়েগনার**-এর এই মতবাদ **কন্টিনেন্টাল ড্রিফট (continental drift)** নামে পরিচিত। এর সাথে তাল মিলিয়ে প্রাণিকুলের বিস্তারেও প্রভাব পড়েছে। এজন্য একই ধরনের প্রাণী সুদুর মহাদেশগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো প্রাণী একটি নির্দিষ্ট মহাদেশেই সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ উদ্ভিদ বা প্রাণীকে ঐ অঞ্চলের **এন্ডেমিক** বলে। যেমন— অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু, নিউজিল্যান্ডে কিউই, বাংলাদেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রভৃতি। **প্রাণিভূগোল হলো বায়োজিওগ্রাফী নামক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে প্রাণী প্রজাতিগুলোর অতীত ও বর্তমানকালে ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়।**

আবার, প্রাণী বিস্তৃতির বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রাণী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন যাকে বলা হয় **প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল**।

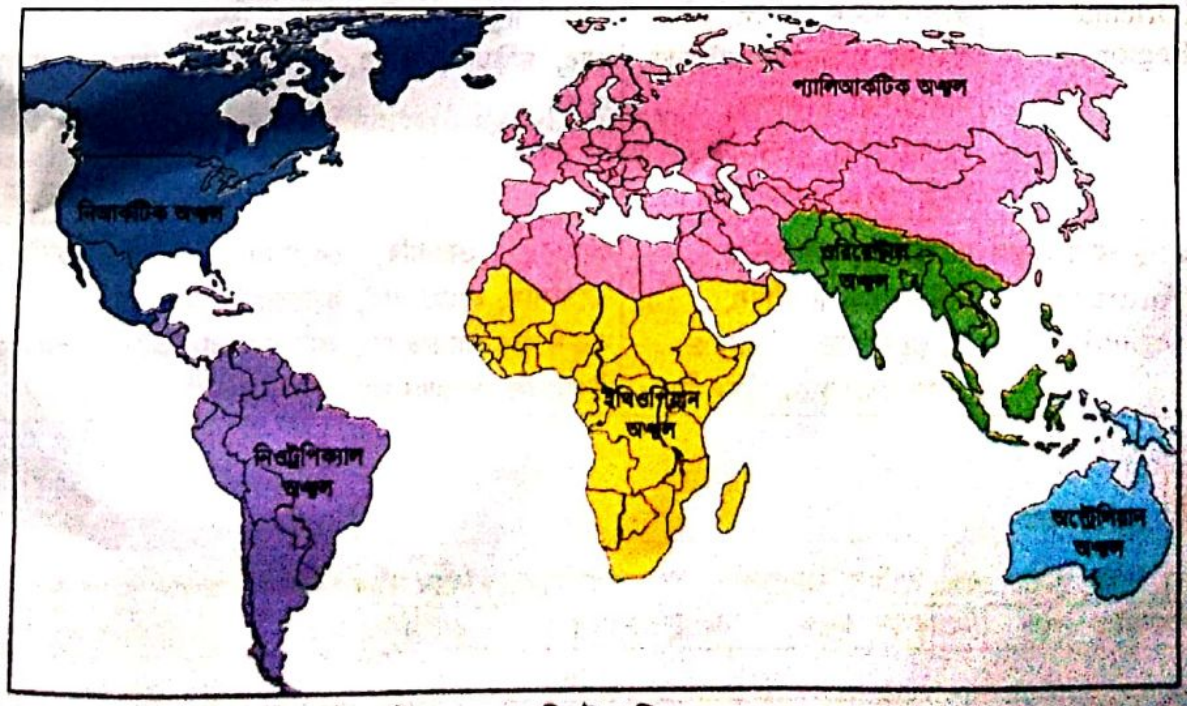

চিত্র-১২.৮: প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

প্রাণিভূগোলের ধারণাটি প্রথম পি. এল. সিয়েটার (P.L. Sciater) ১৮৫৭ সালে প্রস্তাব করেন। তিনি পৃথিবীর বুকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিস্তৃতির ভিত্তিতে ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। ১৮৭৮ সালে **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (A. R. Wallace) এ বিভাজনকে সমর্থন করেন এবং সামান্য পরিবর্তন করেন।

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল	অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহ
১. প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic Region)	সম্পূর্ণ ইউরোপ, আফ্রিকার উত্তর অংশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাড়া এশিয়ার বাকি অংশ।	হরিণ, ভল্লুক, নেকড়ে, ভোঁদড়, বলগা হরিণ, গরু, ম্যান্ডারিন হাঁস, কবুতর, উটপাখি, পেলিকান, ফ্লেমিংগো, চায়নিজ সাকার, চায়নিজ এলিগেটর, প্যাডল ফিস, সাকার ফিস, ক্যাটফিস।
২. নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic Region)	উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ, গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড।	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াঙ্কা, মেরু শিয়াল, নেকড়ে, ভল্লুক, ক্যাঙ্গারু, বাইসন, লাল হরিণ, টার্কি, শকুন, হামিং বার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, কুমির, প্রবাল, র‍্যাটল সাপ, কাকলাস, স্যালামান্ডার, সাকার ফিস, ক্যাটফিস।
৩. নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical Region)	সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ও অধিকাংশ মধ্য আমেরিকা।	ভল্লুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, উটপাখি, রিয়া, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিং বার্ড, কুমির, বৃহৎ কচ্ছপ, কোরাল সাপ, ভাইপার, অ্যানাকোন্ডা, বাইম মাছ, লাংফিস, ক্যাটফিস, পিরানহা।
৪. ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian Region)	সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ অঞ্চল, মাদাগাস্কার ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপ, আরবের দক্ষিণ অঞ্চল।	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদড়, হায়েনা, গন্ডার, বেবুন, আর্মাডিল্লো, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, কুমির, গুইসাপ, লোমশ বানর, বাজপাখি, উটপাখি, শকুন, ফিঙে, সারস, বোয়াপাইথন।
৫. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Region)	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো-চীন, ফিলিপিন্স এবং তাইওয়ান।	বাঘ, এশীয় হাতি, ভল্লুক, ওরাং ওটাং, টাপীর, লজ্জাবতী বানর, বাদুড়, বনরুই, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্লু-বার্ড, ময়ুর, ঘড়িয়াল, কুমির, গুইসাপ, রুই, কাতল, পাঙ্গাস, মৃগেল ।
৬. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian Region)	অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপ।	ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লাবি, কোয়েলা, ওমব্যাট, প্লাটিপাস, অপোসাস, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি কাকাতুয়া, টিয়া, এমু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠ ঠোকরা, কিউই, স্ফেনোডন, টিফলপস, লাংফিস মাছ।

শ্রেণির কাজ

ক্যাঙ্গারু, কিউই, ব্লু-বার্ড, বোয়া, লাংফিস, স্যালামান্ডার, পেলিকান প্রাণীগুলোকে নিচের সঠিক ভৌগোলিক অঞ্চলে স্থাপন করো।

প্যালিআর্কটিক অঞ্চল	নিআর্কটিক অঞ্চল	নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল	ওরিয়েন্টাল অঞ্চল	অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল

CamScanner

পাঠ ৯ ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
Oriental Region

১২.১৯ ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Region)

এ অঞ্চলটির উত্তরে রয়েছে আফগানিস্তান ও চীন, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইরান ও আরব এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর।

অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, ইন্দো-চীন, শ্রীলংকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, ভূটান, নেপাল ইত্যাদি দেশগুলো ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চল চারটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত। উপ-অঞ্চল চারটি হলো–

১. ভারতীয় উপ-অঞ্চল **(Indian Subregion):** সিন্ধুনদ ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে গোয়া হয়ে মহীশূর পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ও উত্তর ভারত এ অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য বাংলাদেশ এ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

২. সিংহলীয় উপ-অঞ্চল **(Ceylonese Subregion):** ভারতীয় উপদ্বীপের অংশ বিশেষ এবং সমগ্র শ্রীলংকা।

৩. ইন্দো-চীন উপ-অঞ্চল **(Indo-China Subregion):** চীনের প্যালিআর্কটিক সীমানার দক্ষিণাংশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, আন্দামান, তাইওয়ান ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জ।

৪. ইন্দো-মালয় উপ-অঞ্চল **(Indo-Malayan Subregion):** মালয় উপদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

জলবায়ু: এ অঞ্চলে আবহওয়ার বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। তবুও প্রায় সমগ্র অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র (অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয়)। এখানকার দিনরাত্রি প্রায় সমান। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২৫° সে. এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সে.মি.। শীতকালে শুষ্ক তবে গ্রীষ্মকালে আর্দ্র। পার্বত্য এলাকার আবহাওয়া সিক্ত।

উদ্ভিদকুল: ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে ৪ প্রকার স্থলজ বায়োম রয়েছে।

১. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী অরণ্য: মালয়ান ও সিলোনিজ উপাঞ্চলের সাথে কিছুটা ভারতীয় উপাঞ্চলে এমন বনভূমি আছে। এতে গভীর সুউচ্চ চিরসবুজ অরণ্য সৃষ্টিকারী প্রধান গাছগুলো হলো জলপাই, কাঁঠাল, জাম, বট ইত্যাদি।

২. সিক্ত পত্রঝরা বনভূমি: ভারত, মায়ানমার এবং ইন্দো-চীনে অবস্থিত যাতে শাল, পলাশ, চাপলাশ, কড়ই প্রভৃতি গাছ বেশি।

৩. তৃণভূমি: ভারত, মায়ানমার ও ইন্দো-চীন জুড়ে অবস্থিত। এখানে ছোট ছোট ঘাসের মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় ও বৃক্ষ থাকে।

৪. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল: সমুদ্র উপকূল জুড়ে অবস্থিত যা ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে গঠিত। যেমন- সুন্দরী, কেওড়া, পশুর, গেওয়া, উরা, গোলপাতা প্রভৃতি।

প্রাণিকুল: এ অঞ্চলে বহু ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী পাওয়া যায়। তবে এন্ডেমিক প্রাণীর সংখ্যাও যথেষ্ট।

স্তন্যপায়ী: রয়েল বেঙ্গল টাইগার *(Panthera tigris)*, এশীয় হাতি *(Elephas maximus)*, উল্লুক *(Hylobates hoolock)*, ওরাং ওটাং *(Pongo pygmaeus)*, এশীয় বানর *(Macaca mulatta)*, চিত্রা হরিণ *(Axis axis)*, চিতাবাঘ *(Canis javanica)*, বনরুই *(Manis craussicaudata)*, পান্ডা, দুই শিং গন্ডার, চশমাপরা হনুমান, শুশুক, বনগরু, বাদুড়, কাঠবিড়ালী, উদ, শিয়াল, সিংহ, খরগোশ প্রভৃতি।

পাখি: হাড়গিলা *(Leptoptilos javanicus)*, শ্বেত কাকাতুয়া *(Cacatua alba)*, বর্মী ময়ুর *(Pavo muticus)*, ময়ুর *(Pavo cristatus)*, জালালি কবুতর *(Columba livia)*, বনমোরগ *(Gallus gallus)*, দোয়েল *(Copsychus saularis)*, প্যাঁচা *(Bubo bubo)*, চিল, ঈগল, ধনেশ, চড়ুই, শালিক, বাবুই প্রভৃতি।

মিঠা পানির মাছ: তারা বাইন *(Macrognathus oral)*, তিলা শোল *(Channa barca)*, মেনি *(Nandus nandus)*, বাচা *(Eutuopictthyes vacha)*, আইড় *(Aorichthys aor)*, পাবদা (*Ompok pabda*), শোল, টাকি, কই, ইলিশ (*Tenualosa ilisa*) রুই, মাগুর, ফলি প্রভৃতি।

উভচর: গারো পাহাড়ী ব্যাঙ *(Rana garoensis)*, ডানিয়েলের ব্যাঙ *(Rana daniel)*, জলপাই রঙা ব্যাঙ *(Ramanella minor)*, কুনোব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ, স্যালামান্ডার, ইকথিওফিস প্রভৃতি।

সরীসৃপ: বড় কাইট্টা *(Batagur baska)*, কাছিম *(Kachuga kachuga)*, সিলেটি কাছিম *(Kachuga sylhetensis)*, গোখরা *(Naja naja)*, মাটির কচ্ছপ *(Indotestudo elongata)*, কুমির *(Crocodylus palustris)*, গুইসাপ *(Varanus bengalensis)*, ঘড়িয়াল *(Gavialis gangeticus)*, রক্তচোষা *(Calotes versicolor)*, অজগর *(Python morulus)*, কেউটে, উড়ুক্কু প্রভৃতি।

সারণি: ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কয়েকটা এন্ডেমিক (endemic) প্রাণীর নাম

গ্রুপ	বাংলাদেশ	বৈজ্ঞানিক নাম
মাছ (Osteichthyes)	পাবদা মাছ সবুজ রুই	*Ompok pabda* *Labeo fisheri*
উভচর (Amphibia)	গারো পাহাড়ী ব্যাঙ	*Rana garoensis*
সরীসৃপ (Reptilia)	ঘড়িয়াল সিলেটি কাছিম মিঠা পানির কুমির	*Gavialis gangeticus* *Kachuga sylhetensis* *Crocodylus palustris*
পাখি (Aves)	সবুজ বুলবুলি বর্মী ময়ুর	*Chloropsis hardwickii* *Pavo muticus*
স্তন্যপায়ী (Mammalia)	শুশুক বনরুই এশীয় হাতি সিংহলেজী বানর	*Platinista gangetica* *Manis craussicaudata* *Elephas maximus* *Macaca silenus*

পাবদা মাছ
(Ompok pabda)

সবুজ রুই
(Labeo fisheri)

গারো পাহাড়ী ব্যাঙ
(Rana garoensis)

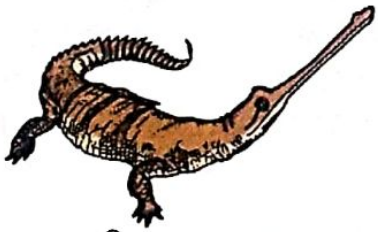

ঘড়িয়াল
(Gavialis gangeticus)

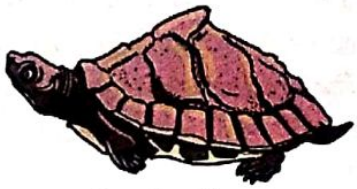

সিলেটি কাছিম
(Kachuga sylhetensis)

সবুজ বলবুলি
(Chloropsis hardwickii)

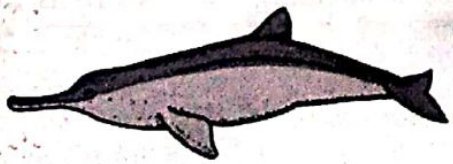

শুশুক
(Platanista gangetica)

সিংহলেজী বানর
(Macaca silenus)

চিত্র-১২.৯: ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কয়েকটি এন্ডেমিক প্রাণী

বাড়ির কাজ

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের একটি তালিকা তৈরি করো।

CamScanner

পাঠ ১০

বাংলাদেশের বনাঞ্চল: পর্ণমোচী বনাঞ্চল
Forest of Bangladesh: Deciduous Forest

১২.২০ বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বাংলাদেশের বনভূমির ইতিহাস অতি প্রাচীন। কারণ বেদ উত্তর রামায়ণ ও মহাভারতে বাংলাদেশের কিছু বনবৃক্ষ যেমন বেল, শাল, কদম, পলাশ, বট, পাকুড়, অশ্বত্থ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। ধারণা করা হয় ২.৬ হতে ৬.৬ কোটি বছর পূর্বে (টারশিয়ারি যুগে) বাংলাদেশের কিছু অংশে বিস্তৃত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি ছিলো। বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৩% (২০১৫)। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১৫ সে. মি. যা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ক্রমশ হ্রাস পায়। গড় আর্দ্রতার পরিমাণ ৮০% এর বেশি। শীতকালে তাপমাত্রা ১৭.৮° সে. এবং গ্রীষ্মকালে ৩৪.৭° সে.।

জলবায়ুর বৈচিত্র্য এবং উদ্ভিদের ধরনের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের বনভূমিগুলোকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন–

i. পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest)
ii. চিরহরিৎ ও মিশ্রচিরহরিৎ বনাঞ্চল (Evergreen and Semi-evergreen forest)
iii. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest)

১২.২০.১ পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous Forest)

যে বনের সকল বৃক্ষের পাতা একসাথে ঝরে যায় তাদের দ্বারা গঠিত বনকে পর্ণমোচী বন বলে। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের পাহাড়িয়া অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ প্রধানত পলিঘটিত সমভূমি।

এ সমতল ভূমির মাঝে মাঝে রয়েছে কতকগুলো পর্ণমোচী বনাঞ্চল। বেশির ভাগ বনভূমি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং গাজীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় বলে। এছাড়া শেরপুর জেলায় গারো পাহাড়ের পাদদেশ কুমিল্লা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ জেলায় এমন বনভূমি আছে। পর্ণমোচী বনের প্রধান বৃক্ষ শাল *(Shorea robusta)* তাই এগুলো **শালবন** নামে পরিচিত। জানা যায় সুদূর অতীতে দার্জিলিং থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত একটি মাত্র শালবন ছিলো।

বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য: পর্ণমোচী বনাঞ্চলে অনধিক ৬০ ফুট উঁচু ছোট ছোট টিলা আছে। টিলাগুলোকে **চালা** বলে আর এদের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিকে **বাইদ** বলে। এখানকার মাটিতে লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকায় বর্ণ হলুদাভ বা লালচে। শুকনো অবস্থায় মাটি শক্ত থাকে এবং বৃষ্টিপাতের পর কাদায় পরিণত হয়। এখানকার মাটি পুরাতন পলি দ্বারা গঠিত। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১৭৫ সে. মি., গড় তাপমাত্রা শীতে ১৭.৮° সে. এবং গ্রীষ্মে ২৬.৭° সে.। বসন্তে গাছে নতুন পাতা আসে আর শীতে পাতা ঝরে যায়।

কয়েকটি শালবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বরেন্দ্র বনাঞ্চল: এটা দিনাজপুর, রংপুর এবং রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। বনগুলো সরু ফালি আকারে বিস্তৃত। **রাংটিয়া ও গজনী বনাঞ্চল:** শেরপুর জেলার উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। **মধুপুর বনাঞ্চল:** টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। **রাজেন্দ্রপুর বনাঞ্চল:** গাজীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। **চন্দ্রা বনাঞ্চল:** গাজীপুর জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। **লালমাই শালবন অঞ্চল:** কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত।

উদ্ভিদকুল: সবগুলো শালবনের প্রধান বৃক্ষ শাল (*Shorea robusta*), তবে অঞ্চল ভেদে অন্যান্য বৃক্ষ বা উদ্ভিদে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রজাতিগুলো হলো বাবলা (*Acacia nilotica*), খয়ের (*A. catechu*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), কুরচি (*Holarrhena antidysenterica*), বহেরা, (*Terminalia belerica*), চালতা (*Dillenia pentagyna*), পটাস (*Grewia microcos*), কোকরা (*Aporusa wallichii*), লজ্জাবতী (*Mimosa pudica*), আমলকি (*Phyllanthus embelica*), কড়ই (*Albizia procera*), মেনফল (*Randia dumetorum*), বেল (*Aegle marmelos*), সেগুন (*Tectona grandis*), জাম (*Syzygium cumini*), মিনজিরি (*Cassia siamea*), নিম (*Azadiracta indica*), লুটকী (*Melastoma malabathricum*), তারালতা (*Eupatorium odoratum*), বননীল (*Tephrosia candida*), সাদা কলমি (*Meremmia umbellata*), মালিয়াট (*Scindapsus officinalis*), টগর (*Tabernaemontana divaricata*), শেওড়া (*Streblus asper*) ইত্যাদি।

CamScanner

প্রাণিকুল : মায়া হরিণ *(Muntiacus muntjak)*, বানর *(Macaca mulatta)*, শিয়াল *(Canis aureus)*, খাটাস *(Viverricula indica)*, মেছো বিড়াল *(Felis viverrinus)*, পটকা ব্যাঙ *(Uperodon globulosus)*, তক্ষক *(Gekko gecko)*, কালি কাইট্টা *(Herdella thurjii)*, ভুতুম পেঁচা *(Bubo zeylonensis)*, তিতির *(Francolinus sp)*।

একক কাজ

পর্ণমোচী বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো।

পাঠ ১১

বাংলাদেশের বনাঞ্চল: চিরহরিৎ, মিশ্র চিরহরিৎ বনাঞ্চল
Forest of Bangladesh: Evergreen, Semi Evergreen Forest

১২.২১ চিরহরিৎ, মিশ্র চিরহরিৎ বনাঞ্চল (Evergreen, Semi Evergreen Forest)

চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ বনাঞ্চল যথেষ্ট দীর্ঘ এবং বিস্তীর্ণ। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ হতে পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে উত্তর পূর্ব অংশ পর্যন্ত বিদ্যমান। এ বনাঞ্চল কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এবং শেরপুর জেলা নিয়ে গঠিত।

বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য: বন উঁচু-নিচু পাহাড়ে অবস্থিত, যাদের গড় উচ্চতা ১৫০-৪৫০ মিটার। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০-২৫০ সে. মি. । তবে সিলেটে সর্বাধিক ৫০০ সে. মি.। মাটিতে হিউমাস বা জৈব যৌগ বেশি থাকায় বর্ণ কালো। জলবায়ু আর্দ্র ও ক্রান্তীয়। অধিক উঁচু বৃক্ষগুলো পর্ণমোচী স্বভাবের বাকি অধিকাংশ বৃক্ষ চিরহরিৎ। উদ্ভিদের ধরনের উপর নির্ভর করে এলাকাকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১. **চিরহরিৎ বন:** চিরহরিৎ বনের অধিকাংশ বৃক্ষের পাতা এক সঙ্গে ঝরে পড়ে না (মোচন হয় না)। আর মিশ্র চিরহরিৎ বনের কিছু উদ্ভিদের পাতা এক সাথে ঝরে পড়ে কিন্তু অবশিষ্ট উদ্ভিদের পাতা এক সঙ্গে ঝরে পড়ে না। পাহাড়ের পাদদেশে মাটি আর্দ্র থাকায় চিরহরিৎ বনের সৃষ্টি হয়। এ বনের উদ্ভিদ একাধিক স্তরে সজ্জিত।
উদ্ভিদকুল: গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), বৈলাম/সিভিট (*Swintonia floribunda*), মেহগনি (*Swietania mahagoni*), ছাতিম (*Alstonia scholaris*), বারসেরা (*Bursera serrata*), অশোক (*Saraca indica*), নাগেশ্বর (*Mesua nagessarium*), চাঁপা (*Michelia champaca*), আগর (*Aguilaria agallocha*) প্রভৃতি।

২. **পর্ণমোচী বন:** পর্ণমোচী বনের অধিকাংশ বৃক্ষের পাতা এক সাথে ঝরে যায়। সাধারণত শীতকালে শুষ্ক পরিবেশে পত্রমোচন ঘটে। পাহাড়ের উন্মুক্ত ও শুষ্ক ঢালে এমন বনের সৃষ্টি হয়।
উদ্ভিদকুল: কড়ই (*Albizia procera*), চালতা (*Dillenia pentagyna*), গামার (*Gmelina arborea*), মাদার (*Erythrina indica*), লোহাকাঠ (*Xylia dolbriformis*), পিতরাজ (*Amoora rohituk*), শিমুল (*Bombax ceiba*), কেলিকদম্ব (*Adina cordifolia*), শিল কড়ই (*Albizia lucida*), হরিতকি (*Terminalia chebula*) প্রভৃতি। তবে পাহাড়ী এলাকায় ১৮৬১ সালে সেগুন বন গড়ে তোলা হয়।
এছাড়া চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী উভয় বনে প্রচুর মস, ফার্ন, আরোহী, গুল্ম ও পরাশ্রয়ী জন্মে।

৩. **বাঁশ ঝাড়:** বিভিন্ন দুর্গম-পাহাড়ি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বাঁশ ঝাড় দেখা যায়। এদের সংখ্যাও প্রচুর। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের মধ্যে মুলিবাঁশ (*Melocanna baccifera*), তল্লাবাঁশ (*Bambusa tulda*), বাশনী বাঁশ (*B. vulgaris*) প্রধান। সিলেট অঞ্চলে বাঁশ ঝাড়ের মাঝে মাঝে বেত হয়। আর বেতের মধ্যে খাড়া বেত (*Calamus erectus*) উল্লেখযোগ্য।

৪. **তৃণভূমি (সাভানা):** জুম চাষের পর অব্যবহৃত জমিতে তৃণভূমি বা হুনবন গড়ে ওঠে। তৃণভূমি এলাকায় বৃষ্টি কম হয় এবং বৃক্ষের পরিবর্তে সেখানে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় । চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেখানে বৃক্ষের সংখ্যা কম সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মে। সিলেটে পাহাড়ী শুষ্ক ঢাল ও হাওর এলাকায় তৃণভূমি আছে।
উদ্ভিদকুল: এখানে উলুখড় বা হুন (*Imperata cylindrica*), কাশ (*Saccharum spontaneum*), ইকরা ঘাস (*Erianthus ravennae*), বনকলা (*Musa ornata*), তারালতা (*Eupoterium odoratum*), আসামলতা (*Mikania cordata*) প্রভৃতি জন্মে।

৫. বালিয়াড়ি বন: সমুদ্র তীরবর্তী বালুময় অঞ্চলের বন। এখানে ঝাউ (*Casuarina littorea*), বনঝাউ (*Tamarix gallica*), ছাগলখুর লতা (*Ipomoea pescarpe*) জন্মে।

৬. জলাবন: সিলেট ও সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের রাতারগুল ও হাওর এলাকার বন। রাতারগুল জলাবন (swamp forest) একটি আর্দ্র চিরসবুজ দ্বিস্তরী বন। জংলী গোলাপ বা বন্য গোলাপ (*Rosa involucrata*) শুধু এ জলাবনে জন্মে। এখানে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে হিজল (*Barringtonia acutangula*), করচ (*Pongamia pinnata*), পীতরাজ (*Aphanamixis polystachya*) প্রধান। মাঝারি উদ্ভিদের মধ্যে পাটিপাতা, আসার, কুরচি, আকন্দ (*Calotropis procera*) প্রভৃতি। এখানে শ্যামা (*Panicum stagninum*), বারান্দা (*Panicum repens*), নলখাগড়া (*Phragmites karka*), কাশ (*Saccharum spontaneum*), প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া জংলী আদা (*Alpinia allughas*), কচু (*Colocasia esculenta*), মাখনা, সাদা শাপলা (*Nymphaea pubescens*) প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জলাবনে মেছোবাঘ, বাগদাশ (*Viverra zibetha*), কাঠবিড়ালী, জলার তিতির, মাছরাঙা, হরিকল, বটকল,বক, কালো কাছিম, অঞ্জন, লাউডগা সাপ, গোখরা উল্লেখযোগ্য।

হাওর অঞ্চলের জলাশয়ে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও সাপ ছাড়া ডাঙা অঞ্চলে কোড়া (*Gallicrex cinerea*), হারালী (*Leptoptilos dubius*), বক (*Ardeola grayii*), ডাহুক (*Amaurornis phoenicurus*) পাখিগুলো দেখা যায়। এছাড়া শীতকালে বিভিন্ন প্রজাতির যাযাবর পাখি আসে।

চিরহরিৎ ও মিশ্র বনগুলোতে প্রাপ্ত প্রাণিগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা: বন ছাগল (*Capricornis sumatraensis*), সাম্বার হরিণ (*Rusa unicolor*), চিতাবাঘ (*Panthera pardus*), উল্লুক (*Hylobates hoolock*), মুখপোড়া হনুমান (*Trachypithecus pilcatus*), লজ্জাবতী বানর (*Nycticebus coucang*), কমলা বুক কাঠবিড়ালী (*Dremomys lokriah*), উদ বা ভোঁদড় (*Lutra lutra*), ঘড়িয়াল (*Treron apicauda*), রাজ ধনেশ (*Buceros bicornis*), অজগর (*Python morulus*), হলুদ পাহাড়ী কাছিম (*Indotestudo elongata*), বন্য শূকর (*Sus scrofa*), এশীয় হাতি (*Elephas maximus*), ফিঙে (*Dicrurus adsimilis*), বনমোরগ (*Gallus gallus*), দোয়েল (*Copsychus saularis*), শালিক (*Acridotheres tristis*), কিং কোবরা (*Opiophagus hannah*), ভাইপার সাপ (*Trimeresurus erythrurus*)। এছাড়া খুব সংকীর্ণ পরিসরে আরো দু'প্রকার বন দেখা যায়।

চিত্র-১২.১০: রাতারগুল জলাবন, সিলেট

দলীয় কাজ

বাংলাদেশের চিরহরিৎ বনাঞ্চলের ছবি, বৈশিষ্ট্য ও কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম সংবলিত একটি পোস্টার তৈরি করো।

CamScanner

পাঠ ১২

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
Mangrove Forest

১২.২২ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove Forest)

সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী লবণাক্ত কর্দম সঞ্চিত এলাকায় যে উদ্ভিদ জন্মে তাকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে আর এদের সৃষ্ট বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। এটা এক প্রকার চির সবুজ বন। বাংলাদেশ ও ভারতের **সুন্দরবন** হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এছাড়া চকোরিয়া সুন্দরবনও ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত। সুন্দরবনের আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এর ৬২% বাংলাদেশে অবস্থিত। পটুয়াখালী জেলার পশ্চিম অংশ থেকে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ সুন্দরবনের পূর্বদিকে বাগেরহাট, উত্তরে খুলনা এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সাতক্ষীরা অবস্থিত।

ম্যানগ্রোভ/সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য

১. এ বনভূমি সমুদ্র উপকূলে গড়ান অঞ্চলে অবস্থিত। দিন-রাতে দু'বার এ বনাঞ্চল জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।
২. বনের মাঝে অসংখ্য নদী-নালা, খাল, পুকুর ও স্যাঁতসেতে স্থান রয়েছে।
৩. সবসময় পর্যাপ্ত জলীয়বাষ্প থাকে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২০০ সে. মি.।
৪. এ বনাঞ্চলের মাটির pH ৭ এর কাছাকাছি।
৫. কাদা ও পলি দ্বারা গঠিত।
৬. মাটিতে জৈব বস্তু কম এবং মাটির বর্ণ হালকা থেকে গাঢ় ধূসর।
৭. বনের উদ্ভিদগুলো বহুবর্ষজীবী এবং এগুলোতে শ্বাসমূল, জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, রসালো দেহ, ঠেসমূল, স্তম্ভমূল বিদ্যমান।
৮. লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের ১০-৫০%।

উদ্ভিদকুল: মাটিতে লবণাক্ততার ভিত্তিতে সুন্দরবনকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এ কারণে তিনটি অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে সম্পূর্ণ বনের ৭০-৭৫% বৃক্ষ শুধু সুন্দরী গাছ (*Heritiera fomes*)। এ বনে ৩৩৪ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ১৭টি ফার্ন প্রজাতি জন্মে, তবে **কোনো বাঁশ নেই** কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অর্কিড জন্মে।

১. **হালকা লবণাক্ত অঞ্চল:** এটা বনের উত্তরাংশ। এখানে সুন্দরী, গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হাড়গোজা (*Acanthus illicifolius*), ভোলা (*Hibiscus tiliaceous*), আমুর (*Amoora cuculata*), কাকড়া (*Bruguiea gymnorhiza*), ধুন্দল (*Xylocarpus granatum*) বাইন (*Avicennia officinalis*), টাইগার ফার্ন (*Acrosticum aureum*) প্রভৃতি জন্মে।
২. **মধ্যম লবণাক্ত অঞ্চল:** এটা মধ্যাংশে অবস্থিত। এখানে সুন্দরী গেওয়া মিশ্রিতভাবে জন্মে। এছাড়া পশুর (*Carapa meleocansis*), খাপু (*Rhizophora cungugata*), হিতাল (*Phoenix paludosa*), কেওড়া, গোলপাতা, হাড়গোজা প্রভৃতি।
৩. **চরম লবণাক্ত অঞ্চল:** এটা সুন্দরবনের দক্ষিণ অংশ। এ অংশটি তেমন প্রজাতি সমৃদ্ধ নয়। এখানে গেওয়া, গরান (*Ceriops roxburghiiana*), বাইন অন্যতম। এছাড়া উপরোক্ত তিনটি অঞ্চলে আলকুশী (*Mucuna gigantea*), কেয়া (*Pandanus*), বেত (*Calamus rotang*), ধানশী (*Oryza coarectata*) জন্মায়।

প্রাণিকুল: উদ্ভিদের মতো সুন্দরবনও প্রাণিকুলে সমৃদ্ধ। এখানকার স্থলভাগে ২৮৯টি প্রজাতি এবং জলভাগে ২১৯ টি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এছাড়া ৩১৫টি প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়।

সারণি: সুন্দরবনের প্রাণিকুলের সংক্ষিপ্ত তালিকা

গ্রুপ (প্রজাতি সংখ্যা)	বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্তন্যপায়ী (৪২)	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	*Panthera tigris tigris*
	চিত্রা হরিণ	*Axis axis*
	বানর	*Macaca mulatta*
	বন্য শূকর	*Sus scrofa*

গ্রুপ (প্রজাতি সংখ্যা)	বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
পাখি (৩১৫; পরিযায়ী পাখিসহ)	জল কবুতর	*Larus argentatus*
	বনমোরগ	*Gallus gallus*
	মদন টাক	*Letoptilos javanicus*
সাপ (১৮)	কিং কোবরা	*Ophiophagus hannah*
	অজগর	*Python molurus*
	ভাইপার	*Trimeresurus erythrurus*
সরীসৃপ (৩৫; সাপ ব্যতীত)	লোনাপানির কুমির	*Crocodylus porosus*
	গুইসাপ	*Varanus bengalensis*
	ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*
উভচর (৮)	সবুজ ব্যাঙ	*Euphlyctis hexadactylus*
	সোনা ব্যাঙ	*Hoplobatrachus tigerinus*
মাছ (১২০)	কোরাল	*Lates calcarifer*
	লইট্টা	*Harpadon nehereus*
	রূপচাঁদা	*Pampus chinensis*
	ছুরি	*Trichiurus savala*
পতঙ্গ (৩২)	বুনো মৌমাছি	*Apix dorsata, Apix cerana*

চিত্র ১২.১১: সুন্দরবন (ম্যানগ্রোভ বন)

বাড়ির কাজ

বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় সুন্দরবন অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

CamScanner

পাঠ ১৩

উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী
Coastal Forest and Green Belt

১২.২৩ উপকূলীয় বনাঞ্চল (Coastal Forest)

বাংলাদেশের সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশ বঙ্গোপসাগরের সাথে মিশেছে। সম্পূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় ৭১০ কি.মি. লম্বা। বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিমাণ ৪৭,২০১ বর্গ কি.মি.। তার মধ্যে ১২টি জেলা সরাসরি উপকূল বা মোহনায় অবস্থিত। উপকূলীয় বনাঞ্চল কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ২৮ ভাগ বাস করে এসব উপকূলীয় এলাকায়। ভূমি ও উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চল ৩ ভাগে বিভক্ত।

ক. **পূর্ব-উপকূলীয় অঞ্চল:** বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে বদর মোকাম থেকে ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত। এখানে পাহাড় আছে কিন্তু কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৪৫ কি.মি. সমুদ্র সৈকত। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন এখানে অবস্থিত। এখানে বাইন, কাকড়া, গরান, গেওয়া প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া গোলপাতা, হাড়গোজা, নুনিয়া, টাইগার ফার্ন প্রভৃতি দেখা যায়।

খ. **মধ্য-উপকূলীয় অঞ্চল:** ফেনী নদীর মোহনা থেকে সুন্দরবনের পূর্ব পর্যন্ত সমতল অংশ। এখানে ৬০টির মত দ্বীপ আছে এবং প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া। এছাড়া গেওয়া, বাইন, কাকড়া দেখা যায়।

গ. **পশ্চিম-উপকূলীয় অঞ্চল:** সম্পূর্ণ সুন্দরবন এ অঞ্চলের অধীন। এখানে প্রতাপশালী ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে উঠেছে। বনভূমিতে প্রধান উদ্ভিদ গেওয়া, গরান, বাইন, সুন্দরী, গোলপাতা, হিতাল, কাকড়া, হাড়গোজা, টাইগার ফার্ন প্রধান।

১২.২৩.১ উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Plants suitable for Coastal Forest)

১. উদ্ভিদ কাদা মাটিতে জন্মাতে সক্ষম এবং চরম লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
২. সাধারণত গম্বুজ আকৃতির।
৩. মূল খাটো, অনেক উদ্ভিদে স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল উৎপন্ন হয়।
৪. কিছু শাখা মূল O_2 সংগ্রহের জন্য মাটির উপর খাড়াভাবে উঠে আসে, এদের শ্বাসমূল বলে।
৫. উদ্ভিদের পাতা পুরু, অখণ্ড, রসালো বলে শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায়।
৬. অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ঘটে।
৭. পাতায় দ্রবীভূত N_2 এর ঘনত্ব বেশি।
৮. ঠেসমূল, স্তম্ভমূল, শ্বাসমূল প্রভৃতি মাটি ধরে রাখার জন্য উপযোগী এবং ভাঙন রোধ করে।
৯. এদের বীজ হালকা বলে পানিতে ভাসতে পারে।
১০. পাতার অভ্যন্তরীণ লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের শতকরা ১০-৫০ ভাগ।

১২.২৩.২ উপকূলীয় বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Coastal Forest)

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাটি অত্যন্ত প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ। এছাড়া সেখানে দিনে-রাতে দু'বার করে জোয়ার ও ভাটার মতো পরিবেশ বিদ্যমান।

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়। সে সময় কখনও কখনও সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো ঘটনাও ঘটে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে ও ২০০৭ সালে সিডরের মতো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আছে, যা আমাদের দেশে প্রায় নিয়মিত ঘটে থাকে। সিডরে ধ্বংস-প্রায় সুন্দরবন কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাকৃতিকভাবে দ্রুত পুনর্গঠিত হয়েছে। সেজন্য উপকূলীয় অঞ্চলে যদি বনভূমি (উঁচু উপকূলীয় বনভূমি) থাকে তবে তা ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো শক্তিশালী দূর্যোগে বাধা প্রদান করবে এবং ভূখণ্ডের ভেতরের মানুষ, আবাদি জমি ও সম্পদকে সুরক্ষা দেবে। ম্যানগ্রোভ গাছের শাখা মূল-প্রশাখা মূল থেকে খাড়াভাবে প্রচুর শ্বাসমূল সৃষ্টি হয়। এ শ্বাসমূলগুলো বিভিন্ন উচ্চতার এবং অত্যন্ত দৃঢ় প্রকৃতির, এছাড়া ঠেসমূল, স্তম্ভমূল জোয়ার-ভাটায় ভূমি-বাধক হিসেবে কাজ করে। এ বন বিভিন্ন প্রকার পশুপাখির উত্তম সংরক্ষণাগার। মোহনার উপকূলীয় উদ্ভিদ সামুদ্রিক প্রাণীর পুষ্টি

CamScanner

জোগায়। বনের ডাল পালা ও কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। সুন্দরী গাছের কাঠ দিয়ে নৌকা, ঘরের খুটি প্রভৃতি তৈরি হয়। গরান, গেওয়া প্রভৃতি নরম কাঠ নিউজপ্রিন্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। প্রচুর মধু পাওয়া যায়। কতিপয় গাছের বাকল দ্বারা জাল ট্যানিং করা হয়। কতিপয় গাছ থেকে প্রাপ্ত ট্যানিন চামড়া শিল্পে ব্যবহার হয়। আবার ট্যানিন-ফরমালডিহাইড রেজিন প্লাইউডের সিট জোড়া দেবার আঠা হিসেবে ব্যবহার হয়। গোলপাতার রস থেকে গুড় তৈরি করা যায়, এমনকি চোলাইমদ তৈরি হয়।

১২.২৪ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী (Coastal Green Belt)

আমাদের দেশে নিয়মিতভাবে ঋতু পরিবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে ভূখণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। ঝড় গাছপালা, ঘরবাড়ী ও প্রাণিসম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। তাই ঝড়ের কবল থেকে ফসল, ঘরবাড়ি, বনাঞ্চল, কৃষি জমি ইত্যাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবেশতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় বৃক্ষ রোপন করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপকূল বরাবর এবং প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত **একফালি শাখা-প্রশাখাসমৃদ্ধ বৃক্ষ** বেষ্টনীকে (বনায়ন) বায়ু প্রবাহ রোধক বা সবুজ বেষ্টনী বলে। আর যে একফালি ভূ-খণ্ডের উপর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় সেই ভূ-খণ্ডকে **আশ্রয় ফালি** (shelter belt) বলে।

সবুজ বেষ্টনী হিসেবে চিরহরিৎ বৃক্ষের ১৫০ ফুট উচু প্রজাতিগুলো অধিক কার্যকর। তবে আশ্রয় ফালির শুধু কেন্দ্রাংশ দিয়ে সর্বোচ্চ বৃক্ষ রোপন করতে হয় এবং তার উভয় পার্শ্বে ক্রমশ কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম, উপগুল্ম এবং তৃণ রোপণ করতে হয়। এর ফলে বনের **ক্যানোপির** (canopy) প্রস্থচ্ছেদ ত্রিকোণাকার হয়। এখানে সারিগুলোতে ২ থেকে ৫ মি. দূরে দূরে বৃক্ষ আর ১ থেকে ১.৫ মি. দূরে দূরে গুল্ম রোপণ করতে হয়। এমন আশ্রয় ফালি ৫০ ফুট থেকে ২০০ ফুট চওড়া হয় এবং সেটা নির্ভর করে জলবায়ুগত অবস্থা, মাটির প্রকৃতি এবং বাতাসের বেগের ওপর। এছাড়া সবুজ বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য হবে প্রয়োজন মতো। ১৯৯১ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতির পর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ৩০০ কি.মি. লম্বা সবুজ বেষ্টনী তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সবুজ বেষ্টনীর উপযোগী উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলেতি গাব, কেয়া, গোলপাতা, হারগোজা প্রভৃতি। BFRI-এর মতে, লবণ সহিষ্ণু বাঁশ, তাল ও নারিকেল গাছ ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১২.২৪.১ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Coastal Green Belt)

১. প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন— জলোচ্ছ্বাসকালীন সময়ে ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
২. জলোচ্ছ্বাসের গতি ও তার তীব্রতাকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এই সবুজ বেষ্টনী।
৩. ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
৪. জলোচ্ছ্বাসে মানুষের আবাসস্থল তলিয়ে গেলে তারা আত্মরক্ষার জন্য গাছের উপর আশ্রয় নিতে পারে।
৫. সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানী, কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।
৬. বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখির আশ্রয়স্থল হতে পারে।
৭. সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো উদ্ভিদের মূল ভূমিক্ষয় রোধ করে।

১২.২৪.২ সবুজ বেষ্টনী বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Green Belt Plants)

১. সবুজ বেষ্টনী যেহেতু সমুদ্র উপকূলে তৈরি করা হয়, সেহেতু লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন প্রজাতির বৃক্ষ সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।
২. মাটি ক্ষয়রোধের জন্য মূলতন্ত্রের মাধ্যমে যেন তারা মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।
৩. ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের ঝাপটায় যেন ভেঙে না যায় এমন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ বাছাই করতে হবে।
৪. সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে পশু-পাখির খাদ্য, পানীয়, জ্বালানী ও অন্যান্য অর্থকরী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

বাড়ির কাজ

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর গুরুত্ব নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

CamScanner

পাঠ ১৪

জীববৈচিত্র্য
Biodiversity

১২.২৫ জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না পৃথিবীতে কতগুলো উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব রয়েছে। প্রতি বছরই প্রায় ১০,০০০ নতুন পতঙ্গ আবিষ্কার হচ্ছে। ধারণা করা হয় পৃথিবীতে ২০-৫০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অণুজীব রয়েছে। যদিও শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৬–১৭.৫ লক্ষ (প্রায়) প্রজাতির জীব। আবার যুক্তরাজ্যের রয়াল বোটানিক গার্ডেন এর তথ্য মতে, পৃথিবীতে ৩,৯১,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্ত হয়েছে যার ৯৪% (৩,৬৯,০০০) সপুষ্পক উদ্ভিদ। এমনকি প্রতি বছর ২০০০ নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ শনাক্ত হচ্ছে। প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রজাতির আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন মাত্রিক পার্থক্য। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আঙ্গিকের পার্থক্য।

কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (CBD) কর্তৃক প্রদেয় সংজ্ঞা হলো—**"জীববৈচিত্র্য বলতে ভূ-উপরিস্থ, সামুদ্রিক, অন্যান্য জলাভূমি ও যেকোনো ইকোসিস্টেমে অবস্থিত জীবসমূহে বিরাজমান বৈচিত্র্যকে বোঝায়।"** একটি প্রজাতির আন্তঃবৈচিত্র্য, একাধিক প্রজাতির আন্তঃবৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেমের বৈচিত্র্য সবই জীববৈচিত্র্যের অংশ। Biological এবং Diversity নামক দুটি শব্দের সমন্বয়ে Biodiversity শব্দের উদ্ভব (Walter. G. Rosen 1986)।

সারণি: বর্তমানে শনাক্তকৃত প্রজাতির সংখ্যা (IUCN, RED DATA LIST, 2007)

প্রাণিজগত		উদ্ভিদজগত	
গ্রুপ	প্রজাতি সংখ্যা	গ্রুপ	প্রজাতি সংখ্যা
স্তন্যপায়ী	৫,৪১৬	আবৃতবীজী	২,৫৮,৬৫০
পাখি	৯,৯৫৬	নগ্নবীজী	৯৮০
সরীসৃপ	৮,২৪০	টেরিডোফাইট	১৩,০২৫
উভচর	৬,১৯৯	ব্রায়োফাইট ও মস	১৫,০০০
মাছ	৩০,০০০	লাল ও সবুজ শৈবাল	৯,৬৭১
পতঙ্গ	৯,৫০,০০০	বাদামি শৈবাল	২,৮৪৯
মোলাস্কা	৮১,০০০	লাইকেন	১০,০০০
ক্রাস্টেশিয়ান	৪০,০০০	ছত্রাক	১৬,০০০
কোরাল	২,১৭৫	মোট উদ্ভিদ	৩,২৬,১৭৫
অন্যান্য	১,৩০,২০০	মোট প্রাণী	১২,৬৩,১৮৬
মোট প্রাণী	১২,৬৩,১৮৬	সর্বমোট প্রজাতি	১৫,৮৯,৩৬১

(এ তালিকায় ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী জীবাণু অন্তর্ভুক্ত হয়নি)

বাংলাদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্রুপভিত্তিক প্রজাতি সংখ্যা

প্রাণী প্রজাতি: স্তন্যপায়ী-১২১, পাখি-৬৫০, সরীসৃপ-১৫৪, উভচর-৩৪, মাছ-৬৫৩ (৪০২ + ২৫১)।

উদ্ভিদ প্রজাতি: আবৃতবীজী-৩,৬১১, নগ্নবীজী-৫, টেরিডোফাইট-১৯৫, ব্রায়োফাইট-২৪৮, শৈবাল-২,২৪৫, ছত্রাক-২৭৫, সায়ানোব্যাকটেরিয়া-৩০০, ব্যাকটেরিয়া-১৭০। এছাড়া ৩০০ প্রজাতির বিদেশী উদ্ভিদ এসেছে।

বাড়ির কাজ

বর্তমানে শনাক্তকৃত জীববৈচিত্র্যের একটি তালিকা প্রকাশ করো।

CamScanner

পাঠ ১৫

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীব
Endangered Organisms of Bangladesh

১২.২৬ বিলুপ্তপ্রায় জীবের ধারণা (Concept of Endangered Organisms)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হওয়ায় ছোট্ট এ দেশটিতে রয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ সম্ভার। এখন পর্যন্ত যদিও জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভিদ জরিপ করা সম্ভব হয়নি তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় ২ শতাংশ এখানে জন্মায়। প্রকৃতিগত কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এ গাঙ্গেয় বদ্বীপ। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে বনভূমি ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশগত কারণে বা আবাসভূমি ধ্বংসের জন্য অতীতে প্রাপ্ত অনেক উদ্ভিদই আর এখন এ অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায় না অথবা অনেক উদ্ভিদ প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে হয়ত এসব উদ্ভিদ লোকগাঁথা হয়ে দেখা দেবে। উদ্ভিদের International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) ও অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠন সমূহের প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ তালিকাকে **Red List** বলা হয়। এ তালিকাভুক্ত জীবসমূহ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. **বিলুপ্ত প্রজাতি (Extinct Species; EX):** যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ বিশ্বের কোথাও প্রাকৃতিক বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায় না।

২. **অতিবিপন্ন (Critically Endangered; CE):** প্রাকৃতিক পরিবেশে অতিশীঘ্র বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

৩. **বিপন্ন প্রজাতি (Endangered Species; EN):** প্রাকৃতিক পরিবেশে সংখ্যা কম এবং তাদের বংশবিস্তার আশানরূপ নয়, ফলে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৪. **বিপদাপন্ন প্রজাতি (Vulnerable Species; V):** অতীতে বহুল ব্যবহার, আবহাওয়া পরিবর্তন বা বাসস্থান ধ্বংসের কারণে যেসব প্রজাতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে।

৫. **বিরল প্রজাতি (Rare Species; R):** এসব প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা খুব কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত বা ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমিত।

উল্লেখ্য যে, অতিবিপন্ন, বিপন্ন এবং বিপদাপন্ন শ্রেণি ৩ টিকে একত্রে হুমকিগ্রস্ত (threatened) প্রজাতি বলে।

১২.২৬.১ বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের পরিচিতি (Introduction of the Endangered Plants of Bangladesh)

১. **তালিপাম:** বৈজ্ঞানিক নাম *Corypha taliera,* যা Arecaceae গোত্রভুক্ত।

তালিপাম পৃথিবীর কোথাও বন্য অবস্থায় জন্মে না। সবশেষে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় মাত্র দুটি গাছ বন্য অবস্থায় ছিলো। পশ্চিম বাংলার শান্তি নিকেতনের কাছে ১৯৭৯ সালে আর বাংলাদেশেরটি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে) ২০১২ সালে মারা যায়। এটা তালজাতীয় গাছ যা প্রায় ১০ মিটার উঁচু, পাতা প্রায় ৬ মিটার লম্বা, পুষ্পমঞ্জুরি প্রায় ৬ মিটার লম্বা এবং ৬০-৭০ বছর বেঁচে থাকে। মারা যাবার পূর্বে মাত্র একবার ফুল আসে। এ প্রজাতিকে ২০০১ সালে অতিবিপন্ন (CE) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০ সালে গাছে ফুল ও ফল আসে। এরপর সংগৃহীত প্রচুর বীজ থেকে অনেক চারা (৫০০টি) পাওয়া যায় এবং বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে রোপন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু বীজ সিড ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। সেজন্য ২০১২ সালে এ প্রজাতিকে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (প্রায়) হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে তালিপাম বৃহত্তর বাংলায় একেবারে।

CamScanner

২. **মল্লিকা ঝাঁঝি:** বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa*, যা Droseraceae গোত্রভুক্ত।
মল্লিকা ঝাঁঝি বীরুৎ জাতীয়, নিমজ্জিত মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। এটা প্রায় ১০-৩০ সে.মি. লম্বা হয় এবং প্রতি পর্বে ৮টি করে পাতা আবর্তাকারে সাজানো থাকে। এরা পতঙ্গভূক উদ্ভিদ এবং পাতাগুলো ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। এ প্রজাতি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে জন্মে। ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা, রাজশাহী ও পাবনার বিল অঞ্চলে জন্মাতো। বাংলাদেশে সর্বশেষ ১৯৮৭ সালে চলনবিলে পাওয়া গিয়েছিল। জলাবসতি ধ্বংসের কারণে এরা বিলুপ্তির পথে। ২০১২ সালে একে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত (EX) ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. **ক্ষুদে বড়লা:** বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis*, যা Myristicaceae গোত্রের সদস্য।
এটি বাংলাদেশের এন্ডেমিক মাঝারি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাকল রক্ত বর্ণের রেজিন সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম দাগবাহী। নতুন শাখা-প্রশাখা রোমযুক্ত। প্রথমে ১৯৫৭ সালে ডুলাহাজরা বনে এবং সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে সর্বশেষ কক্সবাজারের আপার রিজু বন বিট অফিসের প্রাঙ্গনে একটি মাত্র পুরুষ গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোথাও কোন স্ত্রী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২০০১ সালে এ প্রজাতিকে বিপদাপন্ন (V) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৪. **কুরুদ:** বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata*, যা Arecaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
এটা ছোট আকৃতির তাল জাতীয় উদ্ভিদ। মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু। বাংলাদেশে এটি চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও সিলেট জেলার মিশ্র চিরহরিৎ বনের আর্দ্র ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মায়। এর গোলাকার পাতা দিয়ে **মাথালি** (headgears) তৈরি হয়, ঘরের চালায় ছাউনিতে ব্যবহার হয় এবং মূল মূত্রবর্ধক হিসেবে ব্যবহার হয়। অতি আহরণ এবং বসতি ধ্বংসের কারণে এরা হুমকিগ্রস্ত। ২০০১ সালে এ প্রজাতিকে বিপদাপন্ন (V) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে একে বাগানে রোপন করা হয়ে থাকে। বিহারসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং মায়ানমারে এ গাছ জন্মে।

৫. **রোটালা:** বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simliciuscula*, যা Lythraceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
এটি বাংলাদেশে এন্ডেমিক। এটা বীরুৎ জাতীয়, বর্ষজীবী এবং আর্দ্র ভূমির উদ্ভিদ। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে **হুকার ও থমসন** সংগ্রহ করেছিলেন। এ ক্ষুদ্র উদ্ভিদটি বিশেষ করে ধান ক্ষেতে প্রচুর জন্মায়। তবে হুকার ও থমসনের সংগ্রহের পর একে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। ২০০১ সালে এ প্রজাতিকে "মান বিচার করা হয়নি" (NE) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণি: বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ।

উদ্ভিদশ্রেণি	বৈজ্ঞানিক নাম	স্বরূপ	প্রাপ্তিস্থান
টেরিডোফাইট	১. *Psilotum triquetrum*	বীরুৎ, পরাশ্রয়ী	পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা
	২. *Tectaria chattagramica*	বীরুৎ	চট্টগ্রাম
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	১. *Cycas pectinata*	গুল্ম	বাড়িয়াধালা, চট্টগ্রাম, গারো পাহাড়
	২. *Podocarpus nerifolius*	বৃক্ষ	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল
	৩. *Gnetum funiculare*	লতাগুল্ম	চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	১. *Aquillaria agallocha* (আগর)	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন, মৌলভীবাজার
	২. *Aldrovanda vesiculosa* (মল্লিকা ঝাঁঝি)	জলজ,পতঙ্গভূক	ঢাকা, রাজশাহী
	৩. *Rotala simpliciuscula* (রোটালা)	বীরুৎ	চট্টগ্রাম, সিলেট
	৪. *Knema bengalensis* (ক্ষুদে বড়লা)	বৃক্ষ	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার-(এ)
	৫. *Limnophila cana*	উভচর, বীরুৎ	ঢাকা, পাবনা, জামালপুর-(এ)
	৬. *Rosa involucrata*(জংলি গোলাপ)	জলজ, গুল্ম	সিলেট-এর হাওর
	৭. *Corypha taliera* (তালি পাম)	তালজাতীয় বৃক্ষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	৮. *Licuala peltata* (কুরুদ)	তালজাতীয় বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, সিলেট

CamScanner

১২.২৬.২ বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় (বিপদাপন্ন) প্রাণীর পরিচিতি
(Introduction of the Endangered Animals of Bangladesh)

১. **ঘড়িয়াল:** বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus*। এরা কুমির জাতীয় সরীসৃপ প্রাণী। এদের এক সময় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে পাওয়া যেত। বাংলাদেশে বর্তমানে যমুনা নদী ও পদ্মা নদীর অংশ বিশেষে কখনো কখনো ঘড়িয়াল দেখা যায়। পুরুষ ঘড়িয়াল স্ত্রী ঘড়িয়াল অপেক্ষা বড়, যা প্রায় ৬.৫ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের উভয় চোয়াল সরু হয়ে সামনের দিকে প্রসারিত হওয়ায় তুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। তবে তুণ্ডের অগ্রভাগ ভোতা ও মোটা। ঘড়িয়াল স্বাদু প্রকৃতির গভীর ও প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এরা শান্ত প্রকৃতির প্রাণী এবং শুধু মাছ খেয়ে থাকে। শুকনো মৌসুমে নদীর ধারে বালুতে গর্ত করে ৪০-৫০টি ডিম পাড়ে। ৩ মাস তা দেবার পর বাচ্চা পাওয়া যায়। চামড়া থেকে দামী জুতা ও ব্যাগ তৈরি হয়। এছাড়া বসতি বিনষ্টকরণ এবং জেলেদের জালে আবদ্ধ হয়ে এরা বিলুপ্তপ্রায়। IUCN ২০১২ সালে এ প্রাণীকে অতিবিপন্ন (CE) ঘোষণা করেছে। এদের বসতি সংরক্ষণ ও জেলেদের সচেতন করতে হবে।

২. **মিঠা পানির কুমির:** বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris*। মাঝারি গড়নের সরীসৃপ জাতীয় হিংস্র প্রাণী। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে মিঠাপানির কোনো কুমির পাওয়া যায় না। শুধু বাগেরহাট খানজাহানআলী মাজারের পুকুরে কয়েকটা কুমির আছে। তবে সাফারি পার্কের জন্য ভারতের খামার থেকে কিছু কুমির আনা হয়েছে। বর্তমানে এ কুমির ইরান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়। একটি পরিণত কুমিরের দৈর্ঘ্য ৩-৫ মি. শক্ত চামড়া দ্বারা আবৃত এবং খাটো ও চওড়া তুণ্ডবিশিষ্ট। লেজের উপর দু'সারি খাড়া আঁইশ থাকে যা অগ্রভাগে এক সারিতে পরিণত হয়। দেহের বর্ণ ধূসর বা বাদামি তবে তলদেশ সাদা বা হলুদাভ। পরিণত কুমির মাছ, সাপ, কচ্ছপ, জলজ পাখি, সুযোগ হলে বানর, হরিণ, ও অন্য প্রাণীও খেয়ে থাকে। শীতকালে নদী তীরে বালুতে গর্ত করে ৫০-৫৫টি ডিম পাড়ে। কুমিরের চামড়া দিয়ে দামী ব্যাগ, জুতা প্রভৃতি তৈরি হয়। নির্বিচারে হত্যা ও নিবাস ধ্বংসের কারণে এটা সমগ্র বিশ্বেই বিপদাপন্ন (V) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. **রাজ শকুন:** এর বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus*। রাজ শকুন বৃহদাকৃতির পাখি। এর মাথা লাল এবং পালক কাল। ঠোঁট কালচে বাদামি এবং ঘাড়ে লাল ঝুলন্ত লতিকা থাকে। লম্বায় প্রায় ২.৭৫ ফুট। এরা একা একা বা জোড়ায় থাকে। ভারত, পাকিস্তান থেকে শুরু করে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ গুলোতে পাওয়া যেত। এরা মানব বসতির নিকটে আম বা বট গাছে বাস করে। শীতকালে একটি মাত্র ডিম পাড়ে এবং ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। এর প্রধান খাদ্য মৃতদেহ। এর বিলুপ্তির অন্যতম কারণ হলো গবাদি পশুতে ডাইক্লোফেন নামক ব্যবহৃত ওষুধ। এ ওষুধ সরাসরি শকুনের কিডনি বিনষ্ট করে দেয়। অথচ শকুন কলেরা, যক্ষাসহ নানান জটিলরোগে আক্রান্ত গবাদি পশু খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করে থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। ২০১২ সালে একে অতিবিপন্ন (CE) ঘোষণা করা হয়েছে। এক সময়ের আবাসিক এই পাখি মাঝে মাঝে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায়। এদের সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. **নীলগাই:** বৈজ্ঞানিক নাম *Boselaphus tragocamelus*। নীল গাই এশীয় অ্যান্টিলোপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী। উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট তবে স্ত্রী প্রাণী সামান্য ছোট। মুখের অংশ অনেকটা ঘোড়ার মতো তবে পুরুষ প্রাণীতে দুটি ছোট শিং থাকে। সামনের পা জোড়া অপেক্ষাকৃত লম্বা। গায়ের বর্ণ পুরুষে কালো কিন্তু স্ত্রী ও বাচ্চাদের লালচে বাদামি। লেজের মাথায় একগোছা চুল থাকে। এরা সমতল ভূমিতে ঝোপঝাড় অঞ্চল পছন্দ করে তবে ছোট ছোট পাহাড়েও দেখা যায়। তবে এরা খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। ৭০-৮০ বছর পূর্বে তেতুলিয়ায় সর্বশেষ নীলগাই দেখা গিয়েছিলো। মুসলমান জনগোষ্ঠী এদের নির্বিচারে হত্যা করে মাংস সংগ্রহের কারণে এরা বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত (EX) হয়ে গেছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে দুটি নীল গাই ঢুকেছিল, যা বনবিভাগ প্রজননের জন্য দিনাজপুর রামসাগর জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষণ করে। ২০১৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি স্ত্রী নীল গাইটি মারা যায়। তবে ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে কিছু পাওয়া যায়।

৫. **শুশুক:** বৈজ্ঞানিক নাম *Platanista gangetica*। বাংলাদেশে এর দুটি উপপ্রজাতি রয়েছে। শুশুক হলো ডলফিন জাতীয় জলজ স্তন্যপায়ী। এটা বাংলাদেশের যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, সাঙ্গু, কর্ণফুলি ও হালদা নদী এবং তার শাখা নদীগুলোতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া শুধুমাত্র ভারত ও নেপালের গাঙ্গেয় অববাহিকার এদের পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক শুশুক ২.৫ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের লম্বা ঠোঁট, চর্বিযুক্ত শরীর, গোলাকার পেট ও বড় ফিপার

থাকে। তবে এরা অন্ধ। এক ধরনের হাইপারসনিক শব্দ করে এরা চলে বা শিকার করে। সর্বোচ্চ ২৮ বছর পর্যন্ত এদের আয়ুষ্কাল রেকর্ড হয়েছে। বছরের যেকোনো সময় একটি বাচ্চা প্রসব করে। নানা ধরনের মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা শ্বাস নেবার জন্য মাঝে মাঝেই পানির উপর হাঁচির মতো বিশেষ শব্দ করে। সমগ্র বিশ্বে এদের মোট সংখ্যা ৪,০০০-৫,০০০ হতে পারে। ২০১২ সালে একে বিপন্ন (EN) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মাছ ধরার সময় এদের হত্যা করা, নদীতে বাধ দেয়া, শিকার করা ও পানি দূষণ এদের বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

সারণি: বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় (বিপদাপন্ন) প্রাণী

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. রয়েল বেঙ্গল টাইগার	Royal Bengal Tiger	*Panthera tigris*
২. বনরুই	Chinese Pangolin	*Manis pentadactyla*
৩. শুশুক	Irawaddy Dolphin	*Platanista gangetica*
৪. রাজ শকুন	King Vulture	*Sarcogyps calvus*
৫. ঘড়িয়াল	Garial	*Gavialis gangeticus*
৬. মিঠা পানির কুমির	Mugger Crocodile	*Crocodylus palustris*
৭. বেঙ্গল রুফ কাইট্টা	Bengal Roof Turtle	*Kachuga kachuga*
৮. নীল গাই	Blue Bull	*Boselaphus tragocamelus*
৯. মহা শোল	Tor mahseer	*Tor tor*

সারণি: বাংলাদেশের ১৫টি বিপদাপন্ন প্রাণীর তালিকা	
প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
এশিয়ান হাতি (Asian Elephant)	*Elephas maximus*
কালো ভাল্লুক (Asiatic Black Beer)	*Ursus thibetanus*
শকুন (Slender billed vulture)	*Gyps tenuirostris*
বাজপাখি (Laggar Falcon)	*Falco jugger*
এশিয়ার বৃহৎ কাছিম (Asian Giant tortoise)	*Manouria emys*
নরম শিল্ডের কাইট্টা (Soft shelled turtle)	*Aspideretes gangeticus*
ব্যাঙ (Northern frog)	*Occidozyga borealis*
গজার মাছ (Bulleye snakehead)	*Channa marulius*
বাটা (Batha)	*Labeo bata*
কাল বাউস মাছ (Kalibause)	*Labeo calbasu*
বাইম মাছ (Tire trackeel)	*Mastacembelus armatus*
বউ বা রাণী মাছ (Queen loach)	*Botia dario*
মধু পাবদা (Pabdah catfish)	*Ompok pabda*
চেলা মাছ (Bengal toach)	*Rohtee cotio*
চক মাছ (Indin frog-mouth catfish)	*Chaca chaca*

সারণি: বিশ্বের বিখ্যাত ১০টি বিপদাপন্ন প্রাণীর তালিকা	
বনবউল্লুক (The Bonobo Ape)	*Pan paniscus*
সাইবেরিয় বাঘ (The Siberian Tiger)	*Panthera tigris altaica*
জায়ান্ট পান্ডা (The Giant Panda)	*Ailuropoda melanoleuca*
গরিলা (The Mountain Gorilla)	*Gorilla beringei beringei*
কাল গন্ডার (The Black Rhino)	*Diceros bicornis*
হকসবিল কাছিম (The Hawksbill Turtle)	*Eretmochelys imbricata*
ওরাং ওটাং (The Sumatran Orangutan)	*Pongo abelii*
ফিন তিমি (The Fin Whale)	*Balaenoptera physalus*
এশিয়ার হাতি (The Asian Elephant)	*Elephas maximus*
আমুর চিতা (The Amur Leopard)	*Panthera pardus orientalis*

একক কাজ

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে যেকোনো ৫ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণনা দাও।

CamScanner

পাঠ ১৬

জীববৈচিত্র্য সংকট ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ
Biodiversity Crisis and Conserving Endangered Species

১২.২৭ জীববৈচিত্র্য সংকট ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ (Biodiversity Crisis and Conserving Endangered Species)

পৃথিবীর বুকে সুদূর অতীতে একদিন জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল, তারপর শত শত কোটি বছরের ব্যবধানে জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কত ধরনের (প্রজাতি) জীবের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি ঘটেছে তার সঠিক হিসাব আমাদের নেই। জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয়েছিল ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে। পৃথিবীতে এখন কতগুলো প্রজাতির জীব রয়েছে তারও কোনো সঠিক তথ্য নেই। তবে শনাক্তকৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মোট সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। এর মধ্যে উদ্ভিদ ৩.৫ লাখ আর প্রাণী ১২.৫ লাখ। তবে FAO-র মতে তালিকাবদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মোট সংখ্যা ১৫ লাখ। যাই হোক বিজ্ঞানী মহলের প্রবল ধারণা যে, কম করে হলেও এখনও অন্ততঃ আরো ১৫ লাখ প্রজাতির জীবের বর্ণনা ও নামকরণ বাকি আছে। পাশাপাশি এ পর্যন্ত ৩ লাখ জীবাশ্ম প্রজাতির বর্ণনা ও নামকরণ করা হয়েছে। মনে করা হয়, পৃথিবীতে জীবের উন্মেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রায় ৯৯% এখন বিলুপ্ত। অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন গণবিলুপ্তিই এর প্রধান কারণ। **হঠাৎ করে বিশ্বজুড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রজাতি বিলুপ্ত হলে তাকে গণবিলুপ্তি (mass extinction)** বলে। এ পর্যন্ত ৫ বার গণবিলুপ্তি ঘটেছে এবং প্রতিবারই ৭০%-৯৫% বিদ্যমান প্রজাতি ধ্বংস হয়েছে। ৭-৮ কোটি বছর পূর্বে সর্বশেষ গণবিলুপ্তি ঘটে (৭৬% বিলুপ্ত)। তবে প্রতিটি গণবিলুপ্তির পর ইকোসিস্টেম পুনঃস্থাপিত ও পুনঃসুসংহত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের দ্বিতীয় প্রধান কারণ মানুষ। কারণ মানুষ ও গবাদিপশু খাদ্যসহ বিভিন্ন কারণে কয়েক হাজার উদ্ভিদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। প্রায় ২০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি খাদ্য হিসেবে চাষাবাদ করা হয় এবং এ ২০০টি প্রজাতির মধ্যে ১০০টির খাদ্য, কাঠ, টেক্সটাইল, ওষুধের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ কর্তৃক জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সূচনা হয়েছে মানুষের অস্ট্রেলিয়া (৩০-৪০ হাজার বছর আগে), আমেরিকা (১১-১২ হাজার বছর আগে), মাদাগাস্কার (১৪০০ বছর আগে), নিউজিল্যান্ড (১০০০ বছর আগে) প্রভৃতি ভূ-খন্ডে পৌঁছার পর। যদিও প্রাকৃতিক কারণে নিয়মিতভাবে জীব বিলুপ্তি ঘটে থাকে। একটি প্রজাতি ১০ লক্ষ হতে ১ কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। তারপর সে বিলুপ্ত হয় অথবা বিবর্তিত হয় (M. Soule, ১৯৯৬)। তবে মানুষের কারণে বিলুপ্তির হার প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ১০০ থেকে ১০০০ গুণ বেশি।

বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের মোট সংখ্যা ৩,৮৬৬টি। তন্মধ্যে ২০০১ সালের রেড ডাটা বুক অনুযায়ী ১০৬টি বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে ৬৫০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ১২ প্রজাতি বিলুপ্ত আর ৩০ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ৩৪টি উভচর প্রাণীর মধ্যে ৮টি, ১৫৪টি সরীসৃপের মধ্যে ১৪টি বিলুপ্তির পথে। যেমন- সুন্দরবন থেকে গণ্ডার, বুনোমহিষ, সোয়াম্প হরিণ, হগ হরিণ, চিতা বাঘ ও গাউর পুরোপরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বের ১৫-৩৭% জীব আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আবার আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ৫০% শৈবাল ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রতি বছরে বিলুপ্তি হচ্ছে ২৭,০০০ প্রজাতি (০.৫%)।

১২.২৭.১ জীব বিলুপ্তির কারণ (Cause of Organism Extinction)

ক. ইকোলজিক্যাল কারণ

১. **কম পপুলেশন ও স্বল্প ভৌগোলিক বিস্তৃতি:** যেসব প্রজাতির বিস্তৃতি কম তাদের পপুলেশন সাইজও ছোট থাকে। ফলে সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন- ট্রপিক্যাল প্রজাতিসমূহ।

২. **দেহের আকার ও খাদ্যশৃঙ্খলে অবস্থান:** দেহের আকার যত বড় হবে তাকে খাদ্য, বাসস্থানসহ নানা প্রতিযোগিতায় তত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই তার টিকে থাকার সম্ভাবনা তত কম হবে। যেমন– হাতি, কুমির ইত্যাদি।

৩. **কলোনি গঠনের ক্ষমতা:** কোনো প্রজাতি ইমিগ্রেশনের পর সেখানে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারলে তার বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়।

৪. **পরিবেশীয় নিয়ামক:** বাসস্থানে বিভিন্ন পরিবেশীয় নিয়ামকের (যেমন- খাদ্য সরবরাহ, আবহাওয়া পরিবর্তন, সহবিলুপ্তি, যৌন মিলনের সাথী না পাওয়া ইত্যাদি) অনির্ধারিত ওঠা-নামার কারণে ছোট ছোট পপুলেশনগুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

CamScanner

৫. **ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন:** ছোট ছোট পপুলেশনের ইনব্রিডিং এর ফলে ক্রমশ হোমোজাইগোসিটি বাড়তে থাকে যা নতুন নতুন পরিবেশে অভিযোজনের ক্ষমতা হারায়।

৬. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** এটা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন- আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, দাবানল, ইচ্ছাকৃত ফায়ারিং, হারিকেন, হিমবাহ, জলোচ্ছ্বাস, বৈশ্বিক শৈত্য এবং বন্যা ও খরা।

খ. মানব সৃষ্ট কারণ

১. **বাসস্থান ধ্বংস:** জীব বিলুপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ হলো বাসস্থান ধ্বংস। মানুষ খাদ্য, বাসস্থান, শিল্প, সড়ক ও মহাসড়ক, বাধ, কারখানার জন্য বনভূমিসহ নতুন নতুন জায়গা অধিগ্রহণ করার ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। এভাবে মধুপুর বন থেকে চিতা বাঘ বিলুপ্ত হয়েছে।

তালিপাম
(Corypha taliera)

আগর
(Aquillaria agallocha)

জংলি গোলাপ
(Rosa involucrata)

নীল গাই
(Boselaphus tragocamelus)

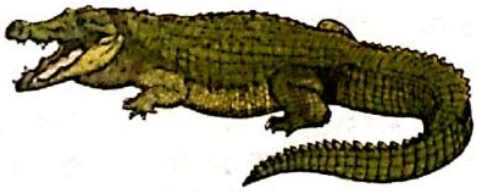

মিঠা পানির কুমির
(Crocodylus palustris)

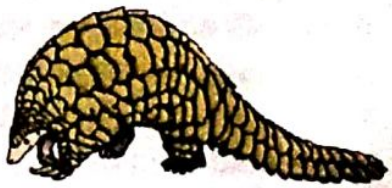

বন রুই
(Manis crausicauelafa)

চিত্র-১২.১২: বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী

২. **অতিমাত্রায় আহরণ:** ব্যবসায়িক কারণে প্রায়শই সম্পদ অতিমাত্রায় আহরণ করা হয়ে থাকে। ফলে এমন প্রজাতিগুলো খুব সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে ডোডো পাখি, বনগরু, বুনো মহিষ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩. **অতিমাত্রায় পশুচারণ:** চারণভূমির স্বল্পতার কারণে চারণভূমিতে এখন গ্রহণীয় মাত্রার চেয়ে বেশি পশুচারণ হচ্ছে। ফলে ঐ ভূমির উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বংশবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে।

৪. **পলিনেটর ধ্বংস:** ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ সহজেই ধ্বংস হয়, যারা গুরুত্বপূর্ণ পলিনেটর। এজন্য পরাগায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়।

৫. **প্রবর্তন ও মনোকালচার:** নতুন নতুন ভ্যারাইটি বা প্রজাতি প্রবর্তনের সময় নতুন নতুন রোগ বালাই-এর আগমন ঘটতে পারে। এছাড়া বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মিটানোর জন্য মনোকালচার হলে স্থানীয় প্রজাতি বা জাতগুলো অবহেলায় বিলুপ্ত হয়।

৬. **দূষণ:** কৃষিকাজে ব্যবহৃত পেস্টিসাইড, শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ, ভারী ধাতু পার্শ্ববর্তী জমি বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এর ফলে ঐ জলাশয়ের মাছসহ প্রাণিসম্পদ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া বায়ুদূষণের কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। পরিবেশ দূষণের এ কারণগুলোর ফলেও জীবের বিলুপ্তি ঘটে থাকে।

CamScanner

১২.২৭.২ বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Conserving Endangered Organisms)

নিচে বিলুপ্তপ্রায় জীবসমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

১. **ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ:** প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। মানব চিকিৎসায় ব্যবহৃত অনেক ওষুধই আসে উদ্ভিদ থেকে। তবুও মানুষ উদ্ভিদ প্রজাতির মাত্র ৫% থেকে ওষুধিগুণ সম্পর্কে জ্ঞাত। অথচ প্রতিদিন প্রায় ১০০ প্রজাতির উদ্ভিদ কোনো না কোনোভাবে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

২. **কৃষিজ জীব সংরক্ষণ:** মানুষের বাসস্থান, খাদ্য ও পোষাকের প্রধান যোগান আসে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে। অনেক বন্য ফসলী উদ্ভিদে রয়েছে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যারা এখন বিলুপ্ত প্রায়। ভবিষ্যতে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন কৃষিজ জীব সৃষ্টির জন্য এদের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

৩. **বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ:** একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের জীবজ উপাদান হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী। মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রাণী তার বেঁচে থাকার সকল উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তুতন্ত্র থেকে। কোনো একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুতরাং সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের অবিরাম প্রবাহের জন্য বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

৪. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** মানুষের জীবন ধারনের জন্য জীববৈচিত্র্য অপরিহার্য। কারণ মানুষের জীবন-যাপন নির্ভর করে বিভিন্ন জীব প্রজাতির উপর। সুতরাং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৫. **অগ্রসরমান অর্থনীতি সংরক্ষণ:** আমাদের চারপাশে অনেক অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী আজ হুমকির সম্মুখীন। এসব জীব বিলুপ্ত হলে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই অগ্রসরমান অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্য বিলুপ্তপ্রায় জীবদের সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. **নান্দিকতা সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। নান্দিকতাকে ভিত্তি করে অনেক দেশে গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশের সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে ব্যবহার করে পর্যটন শিল্প বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এসব সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করার জন্য জীবকূলকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

একক কাজ

বাংলাদেশে জীববিলুপ্তির কারণ উল্লেখ করো।

পাঠ ১৭ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ
Methods of Conservation of Biodiversity

১২.২৮ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ধারণা (Concept of Biodiversity Conservation)

জীববৈচিত্র্যের পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার, পুনরুদ্ধার এবং ভবিষ্যতের জন্য সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ** বলে। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিই হলো সংরক্ষণ। সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোকে নিম্নলিখিত শিরোনামে বিন্যস্ত করা যায়—

১২.২৮.১ প্রাকৃতিক বাসস্থান বা ইনসিট্যু সংরক্ষণ (In-Situ Conservation)

ইনসিট্যু সংরক্ষণ বলতে কোনো প্রজাতি প্রকৃতির বা বায়োস্ফিয়ারের যে অবস্থান ও পরিবেশে জন্মায় তাকে সেই অবস্থানেই সংরক্ষণ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বুনো প্রজাতি এবং প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমগুলো সংরক্ষণ করা হয়। বিশ্বে প্রায় ৪,৫০০টি ইনসিট্যু সংরক্ষণ অঞ্চল আছে। ইনসিট্যু সংরক্ষণে বিশেষ কিছু সুবিধা আছে। যেমন— ১. এভাবে সংরক্ষণ ব্যয় সবচেয়ে কম, ২. নির্ভরশীল অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব টিকে থাকে, ৩. বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া চালু থাকে, ৪. জরিপবিহীন এলাকায় এটাই একমাত্র ব্যবস্থা। প্রজাতিভিত্তিক সংরক্ষণের কৌশল অনুযায়ী ইনসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতি কয়েক প্রকার—

CamScanner

১. **জাতীয় উদ্যান (National Park):** প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের সর্বাঙ্গীন রক্ষার জন্য জীবজন্তু ও গাছপালার স্বাভাবিক নিবাসের বিশাল অঞ্চল সংরক্ষণ করা হলে তা জাতীয় উদ্যান বলে পরিচিত হয়। আইন অনুযায়ী এটা সরকারের (কেন্দ্রীয় সরকার) নিয়ন্ত্রণে ও এখানে সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেয়া হয়। বহিরাগত প্রাণী বা মানুষের যেকোনো প্রকার কার্যক্রম এখানে নিষিদ্ধ থাকে।
তবে বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যানগুলোতে অনুমতিসাপেক্ষে গবেষণা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশে ১৭টি জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় উদ্যানটি হলো- নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান। এছাড়া আরো কয়েকটি জাতীয় উদ্যান হলো— মধুপুর জাতীয় উদ্যান, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের উদ্দেশ্য বসতি এবং প্রাণীকুল সুরক্ষা করা। পাশাপাশি গর্জন, কড়ই, চাপালিস, শিমুল, জাম ও ওকের প্রজাতিসমূহ, বেত, তাল, অর্কিড, ফার্ন প্রভৃতি সংরক্ষণ করা।

২. **ইকোপার্ক (Ecopark):** পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো প্রাকৃতিক এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সার্বিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ইকোলজিক্যাল পার্ককে সংক্ষেপে ইকোপার্ক বলে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাও ইকোপার্কের একটি লক্ষ্য। যেমন- মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, মধুটিলা ইকোপার্ক বঙ্গবন্ধু-যমুনা ইকোপার্ক সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি।

৩. **সাফারি পার্ক (Safary Park):** সাফারি পার্ক এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি যেখানে বন্য প্রাণীরা ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তভাবে বিচরণ করে এবং প্রজননের সুযোগ পায়। আর দর্শনার্থীরা সুরক্ষিত থাকে এবং গাড়ি করে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। যেমন- বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর যা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ।

৪. **বন্য জীব অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary):** যে সংরক্ষিত অঞ্চলে বুনো গাছ-পালার সাথে বিশেষ কিছু বন্য প্রজাতির প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে তা হলো অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্যের মধ্যে অনুমতি সাপেক্ষে কিছু ব্যক্তি মালিকানাও থাকতে পারে। পর্যটন, পশুচারণ, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহসহ কিছু কাজের অনুমতি দেয়া থাকে। প্রতিটি অভয়ারণ্য কোনো না কোনো বন্য প্রজাতি, মাটি ও পানি সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট, তবে সামগ্রিক সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে না। বন্য পশু, পাখি, ডলফিন, মাছ মিলে বাংলাদেশে প্রায় ২১টি অভয়ারণ্য আছে। যেমন- পাবলাখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে চিতাবাঘ, মায়া হরিণ, বনছাগল, মেছোবিড়াল, বন্য শুকর, গর্জন, সেগুন, চম্পা, গামারী, আমুর সংরক্ষণ করা হয়েছে। তেমনি সুন্দরবনে ৩টি অভয়ারণ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, কুমির রয়েছে।

৫. **মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary):** মৎস্য অভয়াশ্রম হলো জলাশয়ের মধ্যে নির্ধারিত সংরক্ষিত এলাকা যেখানে মাছ স্থায়ী আশ্রয় পায় এবং প্রাকৃতিক প্রজনন করে থাকে। নদী, বিল, হাওর, বাওর বা খালের গভীরতম অংশগুলোতে মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করা হয় তাই একই জলাশয়ে একাধিক মৎস অভয়াশ্রম থাকতে পারে। সেখানে বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তার মধ্যে হিজল, করচ, বরুণ, জারুল প্রভৃতি গাছের ডাল ফেলে দেয়া হয়। কচুরিপানা ছেড়ে দেয়া হয় এবং সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করার জন্য লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। মৎস্য অভয়াশ্রমের মাধ্যমে বুনো মাছের স্টক, মৎস্য সম্পদের লাখসই উন্নয়ন, মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ এবং বংশগতীয় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা যায়। ২০০৮-০৯ বর্ষে বাংলাদেশে ৫৬৬টি মৎস্য অভয়াশ্রম ছিলো। মৎস্য অভয়াশ্রম মৌসুমী, সাংবাৎসরিক অথবা স্থায়ী হতে পারে। যেমন- প্রতিবছর ভোলা, বরিশাল, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, শরিয়তপুর (৫ জেলা) এর বড় বড় নদীগুলোতে ইলিশ মাছের প্রজননকালীন সময় অভয়াশ্রম (৬টি, ২০১৬) তৈরি করা হয়। আবার বাইক্কা বিল ও টাঙ্গুয়া হাওর স্থায়ী মৎস অভয়াশ্রম। বাইক্কা বিল ও টাঙ্গুয়ার হাওর দেশি প্রজাতির ছোট মাছ এবং হালদা নদী রুই জাতীয় মাছের (রুই, কাতল, মৃগেল, কালি বাউস) প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।

৬. **বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage):** ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন এলাকা (বা স্থাপনা) কে বিশ্বসম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা যায়। সুন্দরবনকে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (UNESCO)। এছাড়া সুন্দরবন বাংলাদেশের ১ম রামসার অঞ্চল নামে স্বীকৃতি (১৯৯২) পায়।

৭. **গেম রিজার্ভ (Game Reserve):** এটা এমন একটি প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ফাঁদ দিয়ে বন্য প্রাণী ধরা বা মারা নিষিদ্ধ। তবে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকারের স্থান ও মাত্রাসহ অনুমতি দিতে পারেন। যেমন- টেকনাফ বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ। এটি বর্তমানে বন্যজীব অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

CamScanner

ইনসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

১. প্রকৃতি নিজেই তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এ পদ্ধতির মাধ্যমে করে থাকে এবং প্রতিটি জীবকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে থাকে।
২. এটি জীব সংরক্ষণের একটি স্বল্প ব্যয়ের পদ্ধতি, কারণ এ পদ্ধতিতে জীব সংরক্ষণের জন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় না।
৩. সংরক্ষিত প্রজাতিকে নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মাতে সাহায্য করে এবং পরিবেশের ক্ষতিকর উপাদানগুলোকে অপসারণ করা হয়।
৪. এ পদ্ধতিতে জীব প্রজাতিকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়।
৫. এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত জীব পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের সহজেই অভিযোজিত করতে পারে।
৬. একটি প্রজাতির জীবের জীবনচক্রের সাথে, আরো অনেক জানা-অজানা প্রজাতির জীব সম্পর্কিত। তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ জীব প্রজাতিকে এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে গিয়ে আরো অনেক জানা-অজানা গুরুত্বহীন প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা হয়।

ইনসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

১. ইনসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো সংরক্ষিত এলাকা থেকে জীববৈচিত্র্যের অবৈধ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা অধিকাংশ সময় বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।
২. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের কৃষিজমি, কলকারখানা, বাসস্থান, রাস্তা ও রেললাইন ইত্যাদি স্থাপনের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন বলে বিশাল আয়তনের ভূখণ্ড পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।
৩. ইনসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিশাল আয়তনের ভূখণ্ডের প্রয়োজন হয়।
৪. সংরক্ষিত এলাকাতে বাস্তুতান্ত্রিক পূর্বাবস্থা (ecological restoration) ফিরিয়ে আনা এবং বিদেশী প্রজাতির জীবদের উচ্ছেদ করা বেশ জটিল হয়ে ওঠে।

১২.২৮.২ কৃত্রিম বাসস্থান বা এক্সসিট্যু সংরক্ষণ (Ex-Situ Conservation)

প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা জীবের মূল বাসস্থান থেকে অপসারিত করে মানুষের নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবেশে জীবন্ত সংরক্ষণ করাকে এক্সসিট্যু সংরক্ষণ বলে। এক্সসিট্যু সংরক্ষণ বিভিন্নভাবে করা যায়।

১. **উদ্ভিদ উদ্যান (Botanic Garden):** উদ্ভিদ উদ্যান এমন একটি এলাকা যেখানে সীমিত পরিসরে পরিকল্পনা মোতাবেক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়, পাশাপাশি বিনোদন, শিক্ষা ও গবেষণা হয়ে থাকে। যেমন- বলধা গার্ডেন (ঢাকাস্থ বলধা গার্ডেনকে "ফুল ও উদ্ভিদের জীবন্ত জাদুঘর" বলা হয়ে থাকে)। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২,০০০ উদ্ভিদ উদ্যান আছে। বিশ্বের সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রায় এক চতুর্থাংশ এখানে সংরক্ষিত। এমনকি এখানে এমন কিছু প্রজাতি আছে যারা বন্য পরিবেশে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে (যেমন- *Opunitia lindheimeri*, যুক্তরাজ্য)।
২. **বীজ ব্যাংক (Seed Bank) বা জিন ব্যাংক (Gene Bank):** নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বীজকে বহু বছর সংরক্ষণ করা যায়। আবৃতবীজী উদ্ভিদের অধিকাংশ (৭০%) প্রজাতির বীজ শুকিয়ে –২০°সে. তাপমাত্রায় শত শত বছর সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- ধান, গম, ভূট্টা। এমন ধরনের বীজের সংরক্ষণাগারকে বীজ ব্যাংক বা জিন ব্যাংক বলে। *Bronus interruptus* প্রজাতি বিলুপ্ত হলেও তার বীজ সংরক্ষণ আছে।
৩. **মাঠের জিন ব্যাংক (Field Gene Bank):** যেসব বীজে (৩০% সপুষ্পক) অধিক আর্দ্রতা বজায় না থাকলে বীজ নষ্ট হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে মাঠে উদ্ভিদ জীবন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এদেশে হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আম, লিচু, নারকেলের ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে। ঈশ্বরদীতে অবস্থিত গবেষণা কেন্দ্রে আখ ও তালের সংরক্ষণ রয়েছে।
৪. **চিড়িয়াখানা (Zoo):** চিড়িয়াখানা এমন একটি স্থাপনা যেখানে জীবন্ত বন্য প্রাণী খাঁচায় বন্দী করে রেখে সেখানে বিনোদন, গবেষণা, প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়। এটা জাতীয় পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠে। যেমন- মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা।
৫. **নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low Temperature Conservation):** অঙ্গজ বংশবিস্তারে সক্ষম অনেক ফসলের অঙ্গজ অংশ যেমন- বাল্ব, রাইজোম, টিউবার, কর্‌ম, কাটিং সাধারণত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি না এদের উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা যায়। ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং ৪-৫° সে. তাপমাত্রায় আলুকে ৫-৭ মাস (হিমাগারে) সংরক্ষণ করা যায়। ১৪°সে. তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় মিষ্টি আলু কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে এভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

CamScanner

৬. **ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ (In-vitro Conservation):** যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদনের হার কম অথবা যাদের বীজকে অর্থোডক্স বীজের মতো সংরক্ষণ করা যায় না কিন্তু অঙ্গজ জননে সক্ষম ক্যালাস টিস্যু (যেমন-কলা) তৈরি করা যায় তাদের জার্মপ্লাজম অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (–১৯৬° সে.) তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে ইন-ভিট্রো (কাচের ভেসেলে) পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে ১০ থেকে ২০ বছর যৌন চক্র ছাড়াই জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে মহিষের শুক্রাণু এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণে সফলতা এসেছে। এছাড়া কার্প জাতীয় বিভিন্ন মাছের জন্য উপযোগিতা যাচাই করা হচ্ছে।

এক্সসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

১. প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশের বিপন্ন প্রায় প্রজাতিগুলোকে এ পদ্ধতিতে দক্ষতার সহিত ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ও প্রজনন করানো যায়।
২. এ পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক জীব প্রজাতিকে সুনির্দিষ্ট স্থানে এনে সংরক্ষণ করা হয়।
৩. গবেষণা, বর্ণনা ও মূল্যায়নের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য। এটি জীব প্রজাতিকে চরম বিপন্নের হাত থেকে রক্ষা করে।
৪. এটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।

এক্সসিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

১. অনেক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় বলে এ পদ্ধতিটি জীব সংরক্ষণের জন্য বেশ ব্যয়বহুল।
২. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ হয় বলে জীবের জেনেটিক বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৩. জীবগুলো ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক বন্যতা হারিয়ে ফেলে। এতে জীব প্রজাতির বিবর্তনগত অভিযোজন ক্ষমতা রহিত হয়।

হাকালুকি হাওর

এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ হাওর এবং এশিয়ার এক বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি, যার আয়তন ১৮১.১৫ বর্গ কিলোমিটার। এটা সিলেট ও মৌলভীবাজারের ৫টি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত। এতে বড়, মাঝারি, ছোট মিলে প্রায় ২৪০টি বিল ও ছোট বড় ১০টি নদী আছে। এছাড়া এতে জলাবন রয়েছে যার অনেকটা বর্ষাকালে ডুবে যায়। ফলে এটা মাছ ও জলজ প্রাণীর অভয়াশ্রমে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে একে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং ২০১২ সালে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ হাওরে বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম আছে। সেজন্য এখানে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান। তবে মানুষের যথেচ্ছ আচরণে আজ এটা হুমকির সম্মুখীন।

এ হাওরে ৫২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১১২টি অতিথি পাখিসহ ৪১৭ প্রজাতির পাখি, ১০৭ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫ প্রজাতির উভচর, ২৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর বাসস্থান। তবে এখানে ৪ প্রজাতির মাছ অতি বিপন্ন (CR) এবং ১৬ প্রজাতির মাছ বিপন্ন (En) ঘোষিত হয়েছে। ২০০৮ সালের IUCN রিপোর্ট অনুসারে এখানে মাত্র ৭৫ প্রজাতির মাছ আছে। এখানে ৭৩ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শাপলা, মাখনা, পদ্ম উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গুয়ার হাওর

এটি সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত যা ছোট বড় ৫১টি জলমহল নিয়ে গঠিত। এর আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ কি.মি.। এটা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ১৯৯৯ সালে একে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং ২০০০ সালে রামসার সাইট ঘোষণা করা হয় (বাংলাদেশের ২য় রামসার অঞ্চল)।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশাল সমাহার রয়েছে এ হাওরে। এখানে ১৫০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, ২০৮ প্রজাতির পাখি (৯২টি জলচর), ১৫০ প্রজাতির মাছ, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ১১ প্রজাতির উভচর রয়েছে। এখানে শীতকালে আরো ১০০ প্রজাতির যাযাবর পাখি আসে। এ জলাশয়ে মহাশোল নামক দুটি বিরল প্রজাতির *(Tor tor* এবং *Tor putitora)* মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া গাং বাইম, তারা বাইম, কালবাউশ মাছ পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে ১০টি প্রজাতির মাছ বিপন্ন (En) ঘোষিত হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে করচ, হিজল, বরুণ, নলখাগড়া, পদ্ম, শাপলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয়রা একে 'বিনা মূল্যের সম্পদ ভান্ডার' বলে থাকে।

হালদা নদী

এটা খাগড়াছড়ি জেলার বদনাতলী পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে মিশেছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ৯৫ কি.মি. এবং গভীরতা ২৫-৫০ ফুট। নদীর সর্তারঘাট থেকে মদুনাঘাট পর্যন্ত ২০ কি.মি. এলাকায় মাছের ডিম সংগ্রহ করা হয়। এটা এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। এটাই বিশ্বে একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউসসহ বিভিন্ন রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত পোনা সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য নদী থেকে হালদার পার্থক্য মূলত পরিবেশগত। যেমন- পূর্ণিমা ও অমাবশ্যায় বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, ঘোলাপানি, তীব্র স্রোত

প্রভৃতির কারণে স্থানীয় ও কর্ণফুলী নদী থেকে আসা মাছগুলো হালদায় ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এপ্রিলের শেষ এবং মে মাসের প্রথমে মাছেরা ডিম ছাড়ে এবং প্রায় ৫ শতাধিক নৌকায় জেলেরা তা সংগ্রহ করে। স্থানীয়ভাবে মাটির কুয়ায় ৪ দিন ডিম রেখে পোনা তৈরি হয় এবং এরপর বিপনন করা হয়।

তবে পঞ্চাশের দশকে এখান থেকে দেশের মোট চাহিদার ৭০% মেটানো যেতো কিন্তু বর্তমানে নদীতে বাৎসরিক সংগৃহীত ডিমের পরিমাণ মাত্র ৩০০ কেজির মতো। নদীতে স্লুইস গেট নির্মাণ, মা মাছ নিধন, পার্শ্ববর্তী এলাকার শিল্পবর্জ্য নদীতে ফেলা এবং বাঁক কেটে ফেলার কারণে এ প্রজনন ক্ষেত্র আজ হুমকির মুখে।

শ্রেণির কাজ

ইনসিট্যু ও এক্সসিট্যু সংরক্ষণের মধ্যকার পার্থক্যগুলো ছকাকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৮

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
Importance of Biodiversity Conservation

১২.২৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Biodiversity Conservation)

১. **খাদ্য বিষয়ক গুরুত্ব:** আমরা অধিকাংশ খাদ্য পেয়ে থাকি বৈচিত্র্যময় জীব থেকে। আদিকাল থেকেই মানুষ খাদ্যের জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র জীববৈচিত্র্যের কাছ থেকে আরও যা পাওয়া যাবে তার তুলনায় আহরণ অনেক কম। আমাদের অধিকাংশ শস্যই এসেছে বুনো উদ্ভিদ থেকে এবং আরও নির্বাচন ও সংকরায়নের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে আরও উচ্চ ফলনশীল শস্য। প্রায় ৮০ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির নানান অংশ আহারযোগ্য বলে জানা গেছে। অথচ বর্তমানে আমাদের ৯০% খাদ্য আসে মাত্র ১৫ প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে। বুনো প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন শস্য উদ্ভিদ আর পাওয়া যাবে না তাই এদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

২. **স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্ব:** সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। কুইনাইন ও পেনিসিলিন ছাড়াও আরও অনেক রোগের ওষুধ ও প্রতিষেধক উদ্ভাবনে জীববৈচিত্র্যের কাছে মানুষ ঋণী। বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির প্রায় ১৪০০ প্রজাতির উদ্ভিদ ক্যান্সার চিকিৎসায় কার্যকর হতে পারে। চেস্টনাট প্রজাতির উদ্ভিদ নির্যাস থেকে এইডস রোগের ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কেবল উদ্ভিদ ও অণুজীবই নয়, বিভিন্ন প্রাণী থেকেও ওষুধ উৎপাদন করা হয়। জীববৈচিত্র্য হারিয়ে গেলে এসব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. **ব্যবসায়িক গুরুত্ব:** বিভিন্ন প্রকার বুনো উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপর নির্ভর করে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ব্যবসা গড়ে ওঠে। যেমন— শুধু সুন্দরবনের উপর ৫-৬ লক্ষ মানুষ সরাসরি জড়িত। পরোক্ষভাবে নির্ভর করে ৩০ লক্ষ মানুষের জীবিকা। আর আমাদের পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে আদিবাসি সম্প্রদায়েরা সম্পূর্ণভাবে বন-জঙ্গালের উপর নির্ভর করে থাকে। সিলেটের হাওর ও উপকূলের জেলেরা এরই প্রকৃত উদাহরণ।

৪. **ইকোট্যুরিজম গুরুত্ব:** ইকোট্যুরিজমের জন্য সাধারণত জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়। বৈচিত্র্যময় জীব দেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর লোক সেখানে আসে এবং এর মাধ্যমে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

৫. **নান্দনিক গুরুত্ব:** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। শহরের কোলাহলময় জীবন থেকে স্বল্পক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে পার্কের বিকল্প নেই। দীর্ঘকালীন অবসরে সাগর পাড়ে বা সংরক্ষিত বনভূমি দর্শন ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জীবনের পরম পাওয়া। এ সৌন্দর্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন দেখতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে সে কারণেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

৬. **বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব:** বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের ১/২ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রটি ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে। বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খল বা খাদ্যজাল ভেঙ্গে পড়ে। কাজেই জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. **সাংস্কৃতিক গুরুত্ব:** প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উদ্দীপনা, মানবিকতা, আধ্যাত্মবোধ ও শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বাংলা সংস্কৃতিতে বাঘ, ভাল্লুক, কুমির, শিয়াল, সাপ, ময়ুর, বিভিন্ন প্রকার লতা, ফুল, ফল বারবার বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ, মন্দিরে এমনসব চিত্রকর্ম দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এ থেকেই বুঝতে পারি জীববৈচিত্র্য ও মানুষ একসূত্রে গাঁথা। এ কারণে এদের সংরক্ষণ করা উচিত।

CamScanner

৮. **নৈতিক দায়িত্ব:** মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য জীবগুলো প্রতিবেশী বা সাথী হিসেবে বসবাস করে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিরীহ প্রাণী, দূর্লভ উদ্ভিদকে সুরক্ষা দেয়া মানুষের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তা না হলে জীব প্রজাতির বিলুপ্তির হার বহুগুণ বেড়ে যাবে।

৯. **শরণার্থী হ্রাস:** পৃথিবীর বহুস্থানে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে জলবায়ুগত অসুবিধা দূর হবে এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে শরণার্থী সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

১০. **অনুপ্রেরণা:** জীববৈচিত্র্য কবি সাহিত্যিক ও চিত্র শিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগায়, কাজে নতুনত্ব ও গতি আনে।

একক কাজ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

প্রজাতি	এটা হলো জীবজগতের মৌলিক একক, যারা শুধু নিজেদের মধ্যে সর্বোচ্চ মিল প্রদর্শন করে এবং উর্বর সন্তানের জন্ম দিতে পারে। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্য মিলিতভাবে গোষ্ঠী আর কতকগুলো গোষ্ঠী মিলে একটি সম্প্রদায় গঠন করে।
জীবগোষ্ঠী	কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির জীবসমূহ।
জীবসম্প্রদায়	একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল সকল প্রজাতির জীব মিলিত ভাবে জীবসম্প্রদায় গঠন করে।
ইকোলজিক্যাল পিরামিড	একটি বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক থেকে খাদক পর্যন্ত প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পিরামিড আকৃতির নকশাকে বোঝায়।
অভিযোজন	একটি নিবাসে সফলভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাকে অভিযোজন বলে।
বায়োম	নির্দিষ্ট পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বৃহদাকৃতির ভৌগোলিক এককেই বায়োম বলে।
প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল	অতীত ও বর্তমানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিস্তারভিত্তিক এলাকা (সীমানা) গুলোকে বোঝায়।
এন্ডেমিক	কোনো প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলে সে প্রজাতিকে উক্ত অঞ্চলের এন্ডেমিক বলে। যেমন- তালিপাম বৃহত্তম বাংলায় এন্ডেমিক।
এক্সোটিক	এক ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রবর্তনকারী জীবকে আগত অঞ্চলের এক্সোটিক বলা হয়। যেমন– আনারস, তেলাপিয়া, বাংলাদেশে এক্সোটিক।
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল	সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী লবণাক্ত কর্দমসঞ্চিত এলাকায় যে গাছপালা উদ্ভিদ জন্মে তাদের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বলে।
সবুজ বেষ্টনী	সমুদ্র উপকূলবর্তী যে অঞ্চলে প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত একফালি শাখাবহুল বৃক্ষ প্রজাতিকে সবুজ বেষ্টনী বলে।
জীববৈচিত্র্য	বাসস্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে পারস্পরিক যে অমিল তার সমষ্টিকে জীববৈচিত্র্য বলে।
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্যের পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার, পুনরুদ্ধার এবং ভবিষ্যতের জন্য সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।
ইনসিটু সংরক্ষণ	প্রাকৃতিক বা নিজস্ব স্বাভাবিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে ইনসিটু সংরক্ষণ বলে।
এক্সসিটু সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্যকে প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে তথা নিজ বাসস্থান থেকে অপসারিত করে নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবেশে সংরক্ষণ করাকে এক্সসিটু সংরক্ষণ বলে।

CamScanner